শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক-প্রকাশক
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

আষাঢ়—১৩৬১

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
উৎপল প্রেস
১১০-১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ।

কবি বন্ধুর শ্রীকরকমলে।

তুমি দিলে মোরে বারে বারে কত
কবিতা কুসুম মধু-সঞ্চিত
ব্যাকুল পুলক রাগ রঞ্জিত
অমিয় ক্ষরিত মনে।

বিজন বনের সুরভি বকুল
মন বাউলেরে করেছ আকুল
সঁপেছি হৃদয় তোমার রাতুল
হৃদয়ে সঙ্গোপনে।

তোমার বীণার মধু ঝঙ্কার
চকিতে মুখর করেছে আমার
স্তব্ধ লেখনী, তাই বারে বার,
নমি তোমা স্মিত মনে

'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলার অসহযোগ আন্দোলন যুগের একজন খ্যাতনামা কর্ম্মী। মাত্র এগার বৎসর বয়সে আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শিশু শিষ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, তুলসী গোস্বামী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত শচীনন্দন এক মঞ্চে বক্তৃতা করতেন এবং বয়সে শিশু হলেও সে যুগের বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বক্তাদের মধ্যেও তাঁর স্থান ছিল বিশিষ্ট। দেশবন্ধু তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'বাঙ্গলার বীর বালক' এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সেণ্ট নেহাল সিং এই অদ্বিতীয় বালক বক্তা ও বীর কর্ম্মীর জীবনী রচনা করে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন।

বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এবং শরৎচন্দ্রের সহিত ইনি সুদীর্ঘকাল অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছেন। সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হয়েছে সবই রচয়িতার স্বচক্ষে দেখা ও স্বকর্ণে শোনা, সেই জন্যে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সাহিত্যিক মূল্যের বিচারের ভার আমরা ন্যস্ত করলুম পাঠক পাঠিকার উপরে

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন

সাহিত্যসাধনাই যে শরৎচন্দ্রের জীবনের একমাত্র পরিচয়, এ নিয়ে অবশ্য কোন দিনই কোন তর্ক উঠবে না। শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট্ ছিলেন, অপরাজেয় কথাশিল্পী ছিলেন। সাহিত্যই তাঁর জীবনের 'সামাম বোনাম' ছিল, একথা যতখানি সত্য, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আলেখ্যটি বাদ দিয়ে রাখলে তাঁর জীবনচরিত যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এ কথাও ততখানি সত্য। জীবনের শেষের দিকের সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর তিনি বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে তিনি অবশ্য কোন দিন অসমসাহসিক বা নাটকীয় কার্য্য কিছু করেননি, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ পনেরটি বৎসর তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত নিজেকে এই আন্দোলনের ধারার মধ্যেই নিমগ্ন রেখেছিলেন। দীপশিখার প্রজ্জ্বলনে অন্ধকার বিদূরিত হয়। কিন্তু আলোকের বিকীরণে শিখার দহনটাই বড়, না প্রদীপের তৈলসঞ্চয় যা নেপথ্যে থেকে শিখার দহনকে অনির্ব্বাণ রাখে সেইটেই বড়, এর চুলচেরা বিচার করা যদি বা সম্ভব নাও হয়, অন্ততঃ তৈলসিঞ্চনের অবদানকে তুচ্ছ মনে করা যায় না। 'ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এবং গাইড' বলতে যা বোঝায়, শরৎচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গলার বহু রাজনৈতিক কর্ম্মীর জীবনে

তাই। অন্তরের অনুরাগ ও প্রেরণা দিয়ে তিনি তাঁদের সঞ্জীবিত করেছেন। মন্ত্রণার সময়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে সত্য পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। দুর্য্যোগের দিনে তাঁদের অন্তরে উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার তিনি করে' দিয়েছেন। পরাজয়ের দিনে পরম স্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি তাঁদের অন্তরের গ্লানি হরণ করেছেন। বিজয়ের উৎসবে প্রশান্ত আশীর্ব্বাদে তাঁদের হৃদয় তিনি শুচিতায় ভরে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র বর্ম্মা থেকে বাঙ্গলায় ফিরে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্য হয়। দেশবন্ধু তখনও দেশবন্ধু হননি, তিনি তখনও ব্যারিষ্টার এবং কবি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পরিচালিত বাঙ্গলা মাসিক পত্র 'নারায়ণে' প্রকাশের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে একটি লেখা চেয়ে পাঠান। শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বামী' গল্পটি রচনা করে', গল্পটির কোন নামকরণ না করে' দাশ মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁকেই গল্পটির নামকরণ করবার ভার দেন। দাশ মহাশয় গল্পটির 'স্বামী' নামকরণ করে 'নারায়ণে' প্রকাশ করলেন (১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস) এবং শরৎচন্দ্রকে পারিশ্রমিক হিসাবে একখানি সাদা চেক পাঠিয়ে দিলেন। চেকের সঙ্গে একখানি পত্রে তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন "অর্থ দিয়ে আপনার মত শিল্পীর রচনার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু আপনার পারিশ্রমিকের জন্যে একখানা চেক পাঠাচ্ছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করবেন এবং চেকে আপনার ইচ্ছামত টাকা লিখে নেবেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না।" শরৎচন্দ্র এই চেকে যদৃচ্ছা টাকার অঙ্ক লিখে

চেক ভাঙ্গিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেকে মাত্র একশ টাকা লিখে চেক ভাঙ্গিয়ে নিয়েছিলেন। গল্পটির মূল্য হিসাবে একশ টাকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অন্য যে কোন মাসিক পত্রে ঐ গল্প দিয়ে শরৎচন্দ্র এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেতে পারতেন। কিন্তু দাশ মশাই তাঁকে সাদা চেক পাঠিয়ে ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে'ই শরৎচন্দ্র ন্যায্য মূল্য অপেক্ষাও অনেক কম টাকাই নিয়েছিলেন। দু'জনেই দু'জনের হৃদয়ের পরিচয় পেলেন এবং উভয়েই পরস্পরের নিবিড় সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন।

১৯২০ সালে ভারতে যখন মহাত্মা গান্ধীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হল এবং অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের মত বাঙ্গলাদেশেরও সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটি গড়ে' উঠল, শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ার বাজে শিবপুরে বাস করতেন। তিনি অবিলম্বে নন-কো-অপারেশন আন্দোলন সমর্থন করে' কংগ্রেসে যোগদান করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাঙ্গলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরামর্শমত শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলাতে কংগ্রেস-সংগঠনের এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সেদিন হাওড়ার যে সকল কর্ম্মী এবং স্বাধীনতার পূজারী নিজেদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে' নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর নেতৃত্ব বরণ করে' নিলেন। তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভবও বটে এবং অবান্তরও বটে, কিন্তু একজনের নাম উল্লেখ না করলে অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হয়ে যাবে। ইনি শিবপুর নাগপাড়া লেনের পরলোকগত প্রবোধচন্দ্র বসু। ধনী ইঞ্জিনীয়ারের একমাত্র সন্তান, বি-এ পাস করে' তখন কলকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী

করছিলেন, নন-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হতেই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগদান করলেন এবং শরৎচন্দ্রের অনুগত সহকারী হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

শরৎচন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' ভাব ছিল না। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন। এই পদ গ্রহণ করার দ্বারা হাওড়া জেলাতে কংগ্রেসের আন্দোলন-পরিচালনার সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপরে এসে পড়ল। শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এই সকল পদাধিকার-বলে তিনি হাওড়া জেলার, বাঙ্গলাদেশের এবং ভারতবর্ষের কংগ্রেস আন্দোলনের একজন প্রধান কর্ম্মী হয়ে দাঁড়ালেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে তাঁর স্থান ছিল বিশিষ্ট এবং অনন্যসাধারণ। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তিনি শিবপুর থেকে কলকাতায় আসতেন। প্রায়ই ভবানীপুরে দেশবন্ধুর গৃহে, কোন কোনদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে নির্ম্মলচন্দ্রের গৃহে, কোনদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয়ে এসে উপস্থিত হতেন এবং দেশবন্ধু এবং কংগ্রেসের অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দেশবন্ধুর অনুগামিদের ভেতরে শরৎচন্দ্রের বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এবং নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে। নির্ম্মলচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কতকগুলি মিল ছিল। প্রথমতঃ নামের মিল। একজন শরৎচন্দ্র আর একজন নির্ম্মলচন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ

উভয়েই অতি অমায়িক, সদালাপী, বৈঠকী গল্পে পটু। তৃতীয়তঃ, উভয়েই তাম্রকূটের একনিষ্ঠ সেবক, স্নানাহার ও নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া সিগারেট, চুরুট বা গড়গড়া কোন না কোন একটার সঙ্গে বিযুক্ত অবস্থা তাঁদের বড় হত না। আর এ ছাড়া দু'জনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। জানি না এই সকল কারণপরম্পরার জন্যই নির্ম্মলচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা হয়েছিল কিনা?

কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনার ব্যাপারে দেশবন্ধু-পরিষদে যখনই কোন দুরূহ বা জটিল সমস্যার উদয় হত, তখনই শরৎচন্দ্রের মন্ত্রণা না হলে চলত না। মন্ত্রণা-দানে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কোন জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি-মোচনের জন্য রথী রথী কর্ম্মীরা যখন বৃহৎ টেবিলের চারিদিকে জটলা পাকিয়ে বসে' মাথা কোটাকুটি করতেন ও সমস্যার গোলকধাঁধার মধ্যে হাবুডুবু খেতেন, শরৎচন্দ্র তখন একান্তে বসে' পেয়ালার পর পেয়ালা চায়ের ধোঁয়া মুখ থেকে পেটে ঢোকাতেন এবং একটা মোটা বর্ম্মা চুরুটের ধোঁয়া টানে টানে মুখ থেকে নাক দিয়ে বার করে দিতেন। সকলে যখন হায়রাণ ও দিশেহারা হয়ে পড়তেন, তখন তিনি সহসা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একটি মোক্ষম পরামর্শে সমস্যার দফা রফা করতেন। এক একদিন আলোচনা শেষ হতে অনেক রাত্রি হয়ে যেত। ফেরবার ট্রাম পাওয়া যেত না, ট্যাক্সি ভাড়া করে' তিনি গৃহে ফিরতেন। অধিক রাত্রে অবসন্ন ক্লান্ত দেহে ট্যাক্সিতে হেলান দিয়ে লুণ্ঠিত-মস্তক নিদ্রালু অবস্থায় যখন তিনি গৃহে ফিরে আসতেন, তখন তাঁকে দেখে পাড়ার অনেক দুষ্ট লোক মনে করত যে, তিনি আকণ্ঠ পান করে' আড্ডা বিশেষ থেকে ফিরে আসছেন। এসব কথা তারা বলাবলিও করত, তাঁর কাণেও আসত; কিন্তু তিনি কখনও কোন

প্রতিবাদ নিজেও করেননি, গুণগ্রাহী অনুচরদের দ্বারাও করাননি। মিথ্যে দুর্নাম ও নিন্দায় তিনি বিচলিত হতেন না, গ্রাহ্যও করতেন না। অখ্যাতিকে তিনি পরোয়া করতেন না, খ্যাতির জন্যেও তিনি লালায়িত ছিলেন না। নীলকণ্ঠের মত কালকূট হজম করবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও যেমন অনেক অন্যায় অশিষ্ট গালাগালি তিনি নীরবে হজম করেছেন, প্রতিবাদ করেননি, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি অনেক মিথ্যে কুৎসা বরদাস্ত করেছেন, প্রতিবাদ করেননি। এই তুষ্ণীম্ ভাব ছিল তাঁর চরিত্রগত।

কংগ্রেস আন্দোলনের যতগুলি প্রোগ্রাম ছিল, সবগুলিতেই যে তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল তা' নয়। চরকা প্রোগ্রামে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। চরকা কেটে দেশ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবে, এ তিনি একতিলও বিশ্বাস করতেন না। খদ্দর তিনি বরাবরই পরতেন —একটা ডিসিপ্লিনের ধারণা থেকে খদ্দর পরতেন। তিনি বলতেন, চরকা-খদ্দরে নিজে বিশ্বাস করি বা না করি, কংগ্রেস যখন খদ্দর পরা নিয়ম করেছে, তখন খদ্দর পরাই উচিত, নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না। তাঁর খুব আস্থা ছিল বিলাতী বয়কটের প্রোগ্রামের ওপরে। বিলাতী পণ্য সর্ব্বতোভাবে বয়কট করলে যে দেশের স্বাধীনতা নিকটতর হবে, এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। গভর্ণমেন্টের খেতাব-বয়কটের প্রোগ্রামও তাঁর খুব মনঃপুত ছিল। তিনি বলতেন "ঐটে স্বরাজের প্রথম মন্ত্র। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট একটা খেতাবের ছাপ মেরে' দিলেই যারা ধন্য হয়, খুশী হয়, তারা অত্যন্ত ছোট; একেবারে দাস মনোভাবাপন্ন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে কখনও উদিত হতে পারে না। আবার খেতাব-ওয়ালাদের চাইতে যারা খেতাবধারীকে খাতির করে,

সম্মান করে, অভিনন্দন জানায়, তারা আরও ছোট, আরও নীচ, এদের কাছে Recognition পায় বলে'ই খেতাব-ধারীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এরাই স্বাধীনতার প্রথম শত্রু।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্যর" উপাধি ত্যাগ করেছিলেন বলে' তিনি কি খুশী যে হয়েছিলেন তা' বলা যায় না। তিনি বলতেন, "কবি মুখ রেখেছেন সমস্ত বাঙ্গলাদেশের। যদিও কবি নন-কো-অপারেশন মুভমেণ্টে বিশ্বাস করেন না, তবুও জালিয়ানওয়ালাবাগের ম্যাসাকারের প্রতিবাদে স্যার উপাধি ত্যাগ করলেন; কত বড় মনুষ্যত্ব তাঁর! বহুলোকের মত তিনি খোশামোদ করে 'নাইট হননি, এ নিছক তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি গভর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধাঞ্জলী। কিন্তু তবুও তিনি তা' দেশের ব্যথা ও অবমাননায় বিচলিত হয়ে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুর মত ত্যাগ করে' শুধু নিজেকে নয়, আমাদের সবাইকে মহিমান্বিত করেছেন।"

শরৎচন্দ্র গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তিনি অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করতেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি কারও চেয়ে কম ছিল না। আচার্য্যদেবের গভীর দেশপ্রেম, স্বদেশীপ্রচারের জন্য তাঁর সারা জীবনের নিরলস প্রচেষ্টা, দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী গোপন দান, তাঁর ঋষিকল্প চরিত্র, তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা প্রভৃতির শতমুখে মুগ্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশংসা করতেন। কিন্তু কতবার ব্যথিতকণ্ঠে তিনি বলেছেন "চাঁদেও কলঙ্ক রয়ে গেল। ওঁর উচিত ছিল স্যর টাইটেল্‌টা ত্যাগ করা। ওঁর মত অত বড় পেট্রিয়ট যে টাইটেল্‌টা ছাড়লেন না এর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।"

বাস্তবিকই খেতাবের ওপরে তিনি আন্তরিক বিরূপ ছিলেন। দেশের কোন ভাল লোক, কোন কৃতবিদ্য বা মহৎ লোক খেতাব পেলে বা খেতাব গ্রহণ করলে, তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা বোধ করতেন। অপর পক্ষে দেশের লোকে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে কাউকে কোন উপাধিতে ভূষিত করলে তিনি বড় আনন্দিত হতেন। বাল গঙ্গাধর তিলককে দেশের লোকে লোকমান্য উপাধি দিয়েছিল, সুবোধ মল্লিককে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এক লক্ষ টাকা দান করার জন্যে দেশের লোকে রাজা উপাধি দিয়েছিল, এগুলি শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লাগত। গান্ধীজীর মহাত্মা উপাধিও শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লাগত। গান্ধীজীর সমস্ত নীতি, মত ও কর্ম্মপদ্ধতি যে শরৎচন্দ্র সমর্থন করতেন বা বিশ্বাস করতেন তা' নয়, কিন্তু তাঁর মুখে মহাত্মাজী ছাড়া গান্ধীজী কখনও শুনিনি। ভক্তিভাবেও তিনি গান্ধীজীকে মহাত্মা বলতেন, ক্রুদ্ধ হলেও গান্ধীজীকে মহাত্মাই বলতেন।

কবে কোথায় কি করে' যে প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু উপাধি প্রচার হয়েছিল, তা' সঠিকভাবে জানা যায় না; কিন্তু এইটি শরৎচন্দ্রের বড় ভাল লাগত। তিনি জীবনে কখনও কোন প্রসঙ্গেই দেশবন্ধুকে সি, আর, দাশ কি চিত্তরঞ্জন বলে' উল্লেখ করেননি। দেশবন্ধুর নিজের গৃহে তাঁর হাইকোর্টের বন্ধুরা সাধারণতঃ তাঁকে সি, আর বলে' ডাকতেন, কংগ্রেসী অনুচরেরা তাঁকে কর্ত্তা বলে' উল্লেখ করতেন এবং বাহিরের লোকেরা অনেকে তাঁকে দাশ সাহেব বলতেন; কিন্তু শরৎচন্দ্র কোনদিন কখনও তাঁকে দেশবন্ধু ভিন্ন অন্য নামে উল্লেখ করেননি বা সম্বোধন করেননি। একদিন তাঁকে পরিহাস করে' বলেছিলুম "আপনার মুখে কি দেশবন্ধু ভিন্ন তাঁর আর কোন

নাম আসেই না? কত লোকে কর্ত্তা বলে, সি. আর বলে, দাশ সাহেব বলে-?"

শরৎচন্দ্র বেগের সহিত উত্তর দিয়েছিলেন, "না, আমার মুখে তাঁর আর কোন নামই আসে না। ঐ ত ওঁর সত্য পরিচয়। কে জানে কে সর্ব্বপ্রথম ঐ একটি নামের মধ্যেই ওঁর ভেতর-বার যথার্থরূপে আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু! দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ভাল-মন্দ নরনারী, পতিত-তুচ্ছ ব্যথিত সকলের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। মানুষের এত বড় দরদী বন্ধু আমি কখনও কোথাও দেখিনি।" বলতে বলতে সেদিন তাঁর নয়ন সজল, কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল। জানতুম দেশবন্ধুকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, অত্যন্ত ভালবাসেন, কিন্তু সে শ্রদ্ধা ও প্রেমের গভীরতা এর আগে এমন করে' কোনদিন উপলব্ধি করতে পারিনি

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের শঙ্খনিনাদে বাঙ্গলায় ছেলেদের মত মেয়েদের প্রাণও জেগে উঠেছিল। কলকাতা থেকে, মফঃস্বলেরও অনেক শহর থেকে অন্তঃপুরচারিনী মহিলারা দেশবন্ধুর কাছে পত্র লিখে এবং অনেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানাতে লাগলেন যে, তাঁরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। মেয়েদের প্রাণে স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগদান করার এই প্রেরণা দেখে দেশবন্ধু সেদিন যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন তেমনি বিব্রতও হয়েছিলেন, মেয়েদের কাজ করবার ব্যবস্থা করা নিয়ে। তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবিজ ম্যানসন' নামক বিরাট পাঁচতলা অট্টালিকা ভাড়া নিয়ে সেখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বাড়ীটি ছিল সেই সময়ে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের স্বরাজ আন্দোলনের কর্ম্ম-কেন্দ্র। এখানে সহস্র সহস্র কংগ্রেসকর্ম্মী জমায়েত হতেন, এখান থেকে নির্দ্দেশ নিয়ে মফঃস্বলের সর্ব্বস্থানে আন্দোলনের বার্ত্তা বহন করে চলে যেতেন, আবার মফঃস্বলের হাজার হাজার শাখা-কেন্দ্র হতে এখানে এসে কর্ম্মপরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, মিলিত হতেন। বহু কংগ্রেস কর্ম্মী এখানে

অবস্থানও করতেন। দেশবন্ধু কিন্তু এই 'ফরবিজ ম্যানসন'-এ মেয়েদের রাখতে বা এই কর্ম্মকেন্দ্রের সঙ্গে মেয়েদের যুক্ত করতে ইচ্ছা করলেন না। তাঁর ইচ্ছা, মেয়েদের জন্যে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা। একদিকে কাজটি জটিল, অন্যদিকে সমগ্র ভারতের কংগ্রেসের কাজের চাপে তার অন্য দিকে মন দেবারও সময় ছিল না একতিল, ওদিকে মেয়েদের তরফ থেকে বারংবার অধীর অনুরোধ: "আমাদের কাজ করবার ব্যবস্থা করে দাও।" দেশবন্ধু বিব্রত হয়ে অনুরোধ করলেন "শরৎবাবু, এই ভার আপনাকে দিলুম, মেয়েদের কাজ করবার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করতে হবে; তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করুন।"

সেদিন বাঙ্গলা দেশে যে ক'জন মহিলা প্রকাশ্যে স্বরাজ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এত বড় বিরাট বাঙ্গলা দেশের পক্ষে হাজার হাজার পুরুষ কর্ম্মীর তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। সারা বাঙ্গলায় ক'জনই বা ছিলেন তাঁরা? আঙ্গুলের কর গুণে হয়ত তাঁদের সংখ্যার হিসাব দেওয়া যেত। উল্লেখযোগ্যাদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধুর ভগ্নী শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, এ্যাণ্টনী বাগান লেনের বিখ্যাত দাশগুপ্ত পরিবারের শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, কুমিল্লার বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী ৺বসন্ত মজুমদারের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, স্বনামধন্যা লোকান্তরিতা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, সংবাদপত্রসেবী পরলোকগত ললিতকুমার ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী চারুলতা ও সুপ্রভা ও শ্রীমতী কমলা দেবী,

শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী গুপ্তা প্রভৃতি। এঁরাই ছিলেন সেদিন বাঙ্গলা দেশের স্বরাজ আন্দোলনের নারী কর্ম্মীবাহিনীর মধ্যে নেতৃস্থানীয়া। অনেক সাধারণ কর্ম্মী অবশ্য ছিলেন। পূজনীয়া বাসন্তি দেবীকে এঁদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তিনি ছিলেন সর্ব্বদাই দেশবন্ধুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

শরৎচন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশবন্ধু ভবানীপুরে নারীকর্ম্ম মন্দির স্থাপন করেন। যে সকল মহিলা সেদিন ঘরসংসার ছেড়ে সর্ব্বোতোভাবে স্বরাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁদের এইখানে রাখবার ব্যবস্থা হয়। শ্রদ্ধেয়া উর্ম্মিলা দেবীকে এই প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করবার ভার দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পরে নারী কর্ম্মীদের সংখ্যা আরো বাড়লে দেশবন্ধু তাঁদের জন্যে মহিলা কর্ম্মী সংসদ নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং শ্রদ্ধেয়া হেমপ্রভা মজুমদারকে তার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার দেন।

নারী কর্ম্মীদের সংখ্যা যা ছিল তাকে অবশ্য নিতান্তই নগণ্য বলা চলে, কিন্তু শরৎচন্দ্র কোনদিন সংখ্যার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের বিচার বা যাচাই করেননি। অনেকদিন এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি বলতেন, "যুগ যুগ ধরে যারা একলা বাড়ীর উঠানের বাইরে যায়নি, রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘর ছাড়া যাদের জন্য সমাজ আর কোন কর্ম্মক্ষেত্র রাখেনি, তাদের ভেতর থেকে আজ হাজারে হাজারে স্বাধীনতার সৈনিক কোথা থেকে আসবে!"

একদিন বলেছিলেন, "পাঁকেই নাকি পদ্ম ফুল জন্মায় তাই দেশের অন্তঃপুরে থেকেও এরা গজিয়ে উঠেছে।"

ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা একযোগে মিশে দেশের কাজে নামলে কিছু কিছু দুর্নীতির আমদানী হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা, তার জবাবে বলেছিলেন "ও প্রশ্নের চুলচেরা বিচারের দরকার নেই। কখনো কোথাও পান থেকে একটু চুণ যদিই বা খসে সেইটেই বড় কথা নয়। মশাল যখন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তখন তার দীপ্তিতে অন্ধকার প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠল কিনা, সেইটেই বড় কথা, তার পোড়া ন্যাকড়া থেকে একটু দুর্গন্ধ বেরুল কিনা, সে প্রশ্ন নিতান্তই তুচ্ছ। বন্যার প্লাবনে সমস্ত দেশ যদি ধুয়ে নির্ম্মল হয়ে যায়, মাঠের পর মাঠ যদি পলিমাটি পেয়ে উর্ব্বর হয়ে ওঠে ত সেই আমার পরম লাভ। কোথায় সেই বানের জলের মধ্যে একটু ময়লা ভেসে এল, কোথায় তাতে দুটো ইঁদুর মরে পচে রইল, তার জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই।"

বাস্তবিক এই মুষ্টিমেয় নারী কর্ম্মীবাহিনী সে দিন স্বরাজ আন্দোলনের প্রোপাগাণ্ডা ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। যেদিন শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী বড়বাজারে পিকেটিং করে গ্রেফতার হলেন, সেই সংবাদ মুহূর্ত্তে সমগ্র কলকাতায় দাবানলের মত ছড়িয়ে গেল। হাজার হাজার লোক সেদিন কংগ্রেস আফিসে এসে গ্রেফতার বরণের জন্যে ভলান্টিয়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছিল। কলকাতার পার্কে পার্কে মেয়েদের বক্তৃতা শুনে জনসাধারণ উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে হাজারে হাজারে কংগ্রেসের সদস্য ও ভলান্টিয়ার হতে লাগল। দোকানে দোকানে মেয়েরা পিকেটিং করার ফলে বিলাতী কাপড়ের বিকিকিনি বন্ধ হতে লাগল। মুষ্টিমেয় নারী কর্ম্মীদের দ্বারাই সেদিন আন্দোলনে অনেকখানি শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করে শরৎচন্দ্র তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে হাওড়া জেলাময় কংগ্রেস কমিটি গঠন, তাঁত চরখা স্থাপন, বিলাতী পণ্য বর্জ্জন, অসহযোগ প্রচার প্রভৃতি কাজে লেগে গেলেন। এ যুগে হাওড়া জেলাতে যাঁরা কংগ্রেসের কাজে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন, পূর্ব্বেই বলেছি, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন শিবপুরের স্বর্গত প্রবোধ চন্দ্র বসু। বিশেষ-উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরো ছিলেন শিবপুরের শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত, অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দোপাধ্যায়, মৌড়ীর শ্রীযুক্ত নারানচন্দ্র বসু (?), মাজুর ডাক্তার অমৃতলাল হাজরা, স্বর্গত সতীসাধন গায়েন, ডোমজুড়ের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়ার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, বিপিন বসু, বালীর শ্রীযুক্ত গুরুপদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, শিবপুরের অগম দত্ত, বিভূতি হাজরা, জীবন মাইতি, অমল মিত্র, শ্রীযুক্ত অজিত মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালোবরণ ঘোষ প্রভৃতি। শিবপুর, সালখিয়া, আন্দুলমৌড়ী, মাজু, মুন্সীর হাট, ডোমজুড় প্রভৃতি অঞ্চলে কংগ্রেস আন্দোলন খুব প্রবল হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁত, চরখা -স্থাপনের জন্যে নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন, নিজেও বহুদিন চরখাতে অনেক সুতো কেটেছিলেন।

জনসভাতে বক্তৃতা করতে শরৎচন্দ্র পারতেন না, তাঁর ঘনিষ্টতম অনুচর স্বর্গীয় প্রবোধ বসুও পারতেন না। সে যুগে কিন্তু বক্তৃতা করাটা ছিল কংগ্রেসের খুব বড় আর দরকারী কাজ। কারণ কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র বক্তৃতা ছাড়া আর কোন উপায়েই প্রচার কার্য্য চালাবার উপায় ছিল না। এই দিককার

অপটুতার জন্যে শরৎচন্দ্র নিজেকে খানিকটা অকেজো (Handicapped) মনে করতেন বটে, কিন্তু তাই বলে অভ্যাসের এবং চেষ্টার দ্বারা বক্তা হয়ে ওঠবার জন্যেও কোন প্রয়াস তিনি কখনো করেননি।

হাওড়া জেলার কর্ম্মীদের ভিতরে নারান বাবুর বক্তৃতা শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লাগত। তাঁর বক্তৃতা ছিল ভীষণ ঝাঁঝালো, অত্যন্ত মারমুখো, তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষে ভরপুর। কোন সভাতে যদি কারো বক্তৃতা একটু ভাল হোত শরৎচন্দ্র কী যে খুসী হতেন! বলতেন, 'অমুকের বক্তৃতা কী চমৎকার হয়েছে, যেমনি ভাষা, তেমনি ডেলিভারী, Splendid বলেছে'। এমনি আরো কত প্রশংসার কথাই না বলতেন! আমরা তাঁকে বলতুম, 'প্রবোধদাকে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতে বলুন।' বলতেন "না না তাহলে ও মরে যাবে, এমনিই এত খাটে, এর পরে আবার বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলে আর ও বাঁচবে না।" প্রবোধদার শরীর ছিল চিরকালই অপটু, ক্রনিক এনিমিয়া রোগ ছিল তাঁর। সেই রুগ্ন দেহ নিয়ে কংগ্রেসের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। শেষ পর্য্যন্ত এনিমিয়া রোগেই তিনি অকালে মারা গেলেন। শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল যে সভাতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল চেঁচিয়ে বক্তৃতা করা একটা গুরুতর পরিশ্রমের কাজ। প্রবোধবাবুর প্রতি শরৎচন্দ্রের স্নেহ ছিল অপরিসীম। শরৎচন্দ্রের বয়স হয়েছিল এই সময়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, আর প্রবোধচন্দ্র ছিলেন চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণ যুবা। কিন্তু সেই প্রাচীন আর নবীনের মধ্যে ছিল অদ্ভুত মনের মিল আর অনুরাগ। প্রবীন নায়কের প্রতি নবীন অনুচরের যেমন ভক্তির অন্ত ছিল না,

নবীন অনুচরটির প্রতিও তেমনি প্রবীন নায়কের স্নেহেরও সীমা ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনের একটা প্রোগ্রাম ছিল সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত এবং খাস সরকারী স্কুল কলেজ বর্জ্জন করা। ভারতের সমস্ত প্রদেশে এই প্রোগ্রামটিতে অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা স্পেশাল কংগ্রেসে নন্‌-কোঅপারেশন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে Govt. & Govt-aided স্কুলকলেজ বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডিসেম্বর মাসে পুনরায় নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সভাপতি বিজয় রাঘবাচারীয়ার। নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস ষোল বৎসরের কম বয়সের ছাত্রদের অভিভাবকদের অনুরোধ করলেন যেন তাঁরা তাঁদের ছেলে মেয়েদের সরকারী স্কুল কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং ষোল বৎসর ও তার বেশী বয়সের ছাত্রদের নিকটে সোজা অনুরোধ করলেন যেন তারা স্কুল কলেজ ছেড়ে দেয়। এই প্রস্তাবে অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল। হাজার হাজার ছাত্রকে (ষোল বছরের কম বয়সের) অভিভাবকেরা ছাড়িয়ে নিলেন এবং হাজার হাজার ছাত্র (ষোল বছরের অধিক বয়স) নিজেরাই বেরিয়ে এল। এই বিপুল ছাত্রবাহিনী কংগ্রেসের কাজে যোগদান করল। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে কলকাতার হাজার হাজার ছাত্র স্কুলকলেজ বর্জ্জন করে বেরিয়ে এল। মহাত্মা গান্ধী এ সময়ে কলকাতায় এলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে দিয়ে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে "ফরবীজ ম্যানসান" নামক বিরাট অট্টালিকাতে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তন"

নাম দিয়ে জাতীয় কলেজ স্থাপন করলেন। ছাত্রদের স্কুলকলেজ থেকে বার করে আনার কার্য্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রবল বাধা পেয়েছিলেন স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। স্যার আশুতোষ যথাসাধ্য দেশবন্ধুকে বাধা দিতে লাগলেন এবং এর প্রতিকূলে জনমত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের বোঝাতে লাগলেন যে, ছাত্রেরা যদি শিক্ষা বর্জ্জন করে, তার দ্বারা দেশের লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবে। স্যার আশুতোষের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর তীব্র মতভেদ এবং বিরোধের সৃষ্টি হল। দেশবন্ধু স্যার আশুতোষের যুক্তির বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা করতে লাগলেন এবং ছাত্রদের দলে দলে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করতে লাগলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে অন্তরের অফুরন্ত আবেগ উৎসারিত ব্যঞ্জনায় ছাত্রদের আহ্বান করলেন "Education may wait but Swaraj cannot. তোমরা গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে এস।" ছাত্রেরা হাজারে হাজারে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। স্যার আশুতোষ সে উত্তাল ভাব-তরঙ্গ-স্রোত প্রতিরোধ করতে পারলেননা।

স্যার আশুতোষ ব্যর্থকাম হবার পরে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। পর পর তিনখানি পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করে তিনি ছাত্রদের স্কুল কলেজ বর্জ্জন করানোর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কবি লিখলেন, অসহযোগের দ্বারা ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মত ব্যবধান রচনা করা হচ্ছে। ছাত্রদের সম্বন্ধে কবি লিখলেন যে, তাদের জন্যে যথোপযুক্ত স্কুল কলেজ আগে তৈরী না করে তাদের সরকারী স্কুল কলেজ ছাড়ানো খুব অন্যায় হচ্ছে। কবির

এই প্রতিবাদের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাত্রদের স্কুল কলেজ ছাড়ানোর বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্বে শরৎচন্দ্রের মনে এক আলোড়ন উপস্থিত হল। কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল বিপুল, তেমনি বিপুল শ্রদ্ধা ছিল দেশবন্ধুর প্রতিও। "কারে নিন্দি কারে বন্দি দুনো পাল্লা ভারি।" কিন্তু কবির প্রতি বিপুল শ্রদ্ধাভক্তি সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্র নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে ছাত্রদের স্কুলকলেজ বর্জ্জন করানোর পক্ষপাতী ছিলেন, নন্-কো-অপারেশন তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মর্ম্মের মধ্যে, মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল নন কো-অপারেশনের দীক্ষা। তাঁর অন্তরের সত্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হল, তাঁর অন্তরের কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তিনি সত্য ও বিশ্বাসকে মস্তকে ধারণ করে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হলেন। কবির প্রতিবাদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র লেখনী ধারণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনে এই প্রথম সংঘর্ষ। দ্বিতীয়বার কবির সঙ্গে তাঁর মৌন সংঘর্ষ হয় ইং ১৯২৬-২৭ সালে "পথের দাবী" নিয়ে এবং তৃতীয় সংঘর্ষ হয় ওরই কিছু পরে "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তরুণ সাহিত্যিকদের নিয়ে। এই তিনবার জীবনে তাঁকে গুরুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, সত্য ও বিশ্বাসের প্রেরণায়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীও ১৯২১ সালের ১লা জুন তারিখের Young India-তে "The Poet's Anxiety" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করে কবির প্রতিবাদের জবাব দিয়েছিলেন। এখানে মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের জবাবে

যা লিখেছিলেন তার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম। মহাত্মাজীর, জবাবের মধ্যেই দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, মহাত্মাজী ও সকল অসহযোগীর (Non-co-operator) তৎকালীন মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছিল:
"The poet's concern is largely about the students. He is of opinion that they should not have been called upon to give up Government schools before they had other schools to go to. Here I must differ from him . I have never been able to make a fetish of literary training. My experience has proved to my satisfaction that literary training by itself adds not an inch to one's moral height and that character-building is independent of literary training. I am firmly of opinion that the Government schools have un-manned us, rendered us helpless and Godless. They have filled us with discontent and providing no remedy for the discontent, have made us despondent. They have made us what we were intended to become—clerks and interpreters. A Government builds its prestige upon the apparently voluntary association of the governed. And if it was wrong to co-operate with the Government in keeping us slaves, we were bound to begin with those institutions in which our association appeared to be most voluntary. The youth of a nation are its hope.

I hold that as soon as we discovered that the System of Government was wholly, or mainly evil, it became sinful for us to associate our children with it.

"It is no argument against the soundness of the proposition laid down by me that vast majority of the students went back after the first flush of enthusiasm. Their recantation is proof rather of the extent of our degradation than of the wrongness of the step. Experience has shown that the establishment of National schools has not resulted in drawing many more students—the strongest and the truest of them came out without any National Schools to fall back upon and I am convinced that these first withdrawals are rendering service of the highest order."

প্রকৃতই সেদিন এই স্কুল কলেজ পরিত্যাগকারী ছাত্ররাই দেশের নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছিল। এদেরি দ্বারা অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল, এরাই দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠন করেছিল। এরাই হয়েছিল সেই আন্দোলনের সৈনিক।

দেশের উপর দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন বয়ে যেতে লাগল। শরৎচন্দ্র কায়মনোবাক্যে এই আন্দোলনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁর উপন্যাস রচনার কাজ শিথিল হয়ে গেল। তাঁর

সখের দাবা খেলা এবং ছিপে মাছ ধরা বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতায় সাহিত্যিক আড্ডাগুলিতে যাওয়া-আসাও বন্ধ করলেন। সামতাবেড়ে তাঁর দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করলেন। সুরাপান বর্জ্জন করলেন। বিকেল বেলা তাঁর আদরের নেড়ী কুত্তা ভেলুকে নিয়ে বেড়ান বন্ধ করলেন, বাড়ীর সখের পোষা পাখীকে আদর করে ছোলা-কলা খাওয়ানোর ভার ছোঠ ভাই প্রকাশের উপরে ন্যস্ত করে দিলেন।

হাওড়া জেলাতে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনার গুরু ভার বহন করেও, তিনি প্রতিদিন কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধুকে তাঁর কাজে বহুতর সাহায্য করতে লাগলেন। সমস্ত জটিল বিষয়ে তিনি দেশবন্ধুকে পরামর্শ দিতেন। তা ছাড়া দেশবন্ধুকে সংবাদ পত্রে যে সকল বিবৃতি মন্তব্য আবেদন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশ করতে হোত তার অধিকাংশই শরৎচন্দ্র রচনা করে দিতেন। এই কার্য্যের অনেকখানি ভার অবশ্য দেশবন্ধুর সেক্রেটারী, শিষ্য এবং পুত্রপ্রতিম শ্রীযুক্ত হেমন্ত সরকারও বহন করতেন।

কর্ম্মের উন্মাদনার মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল। ভারতে সে এক দিন এসেছিল! অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এক সঙ্গে আরম্ভ হওয়াতে ভারতের হিন্দু মুসলমান সেদিন একপ্রাণ, একমন, অভেদাত্মা হয়ে সেই আন্দোলনে আত্মহারা হয়ে যোগ দিয়েছিল। পেশোয়ার থেকে ব্রহ্মদেশ, হিমালয় থেকে কন্যা কুমারীকা সমগ্র ভারতের হিন্দু মুসলমান আপামর জনসাধারণ সেদিন ক্ষিপ্ত প্রমত্ত আত্মহারা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানের সমবেত কণ্ঠের "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লাহো আকবর" রবে সেদিন ভারতের দিক দিগন্ত নিনাদিত।

সেদিন দেখেছিলাম ভারতের আকাশের সূর্য্যে বিশ্বদাহী দীপ্তি, ভারতের অগণিত নরনারীর প্রাণে অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, লক্ষ লক্ষ তরুণের বুকে মরণজয়ী দৃঢ়তা। সেদিন শুনেছি বোম্বায়ের চৌপাঠী সমুদ্রসৈকতে লক্ষ কণ্ঠের গর্জ্জন "বন্দে মাতরম," শুনেছি কলকাতার ময়দানে লক্ষ কণ্ঠে নব যুগের নবসামগীতি "রাম রহিম না জুদা কর ভাই," (হিন্দু মুসলমানে ভেদ কর না)।

জাতীয় জীবনের এই দ্রুত বিবর্ত্তনের মধ্যে শরৎচন্দ্র নিষ্ঠার সহিত একাগ্রতার সহিত দিনের পর দিন জাতীয় আন্দোলনের কাজ করে যেতে লাগলেন। এই সময়ে লক্ষ্য করেছি তাঁর চরিত্রের একটা মহৎ বিশেষত্ব। নাম যশের প্রতি তাঁর একান্ত নিরাসক্ত ভাব। Lime lightএ তিনি কখনো যেতে চাননি। সংবাদ পত্রে নিজের নাম জাহির করা, ছবি ছাপান, এসব তিনি কখনো করেননি। এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও স্পৃহা থাকলে সুযোগের তাঁর অভাব ছিল না। বরঞ্চ তিনি সতত নিজেকে সঙ্গোপনে প্রচ্ছন্ন রেখে দিতেন।

১৯২১ সালের শেষের দিকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে এলেন। ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট পরামর্শ করে ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও জো-হুকুমওয়ালা লয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। বলা বাহুল্য এই ভ্রমণ ব্যবস্থার মূলে ছিল এক গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ভারতবাসী জনসাধারণের মনে রাজভক্তির উদ্রেক করা এবং রাজপুত্রের মুখ দিয়ে ভাল ভাল মিষ্ট কথা ও উজ্জ্বল আশা ভরসার বাণী শুনিয়ে জনসাধারণের চিত্ত ও চিন্তাধারাকে পার্লামেণ্টের প্রতি আস্থাশীল ও নির্ভরশীল করে রাখাই ছিল এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। গভর্ণমেণ্ট ভেবেছিলেন যে এই চালে তাঁরা অসহযোগের জোয়ার বেগকে প্রশমিত করতে পারবেন।

ভারতের ভাগ্য বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে একটু হাসলেন।

কংগ্রেস ঝটিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতের জনসাধারণকে প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনার আয়োজনকে বয়কট করার নির্দ্দেশ দিলেন।

১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস বোম্বাইয়ে পৌঁছিলেন।

মুষ্টিমেয় রাজা মহারাজা ইয়োরোপীয়ান পার্শী ধনী ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা তাহাকে অভ্যর্থনা করল কিন্তু সমগ্র জনসাধারণ এই অভ্যর্থনার উৎসবকে বয়কট করল এবং জনসাধারণের কতকাংশ অভ্যর্থনায় যোগদানকারীদের উপরে আক্রমণ আরম্ভ করল। আক্রমণ প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ হয়ে শেষে বিশাল দাঙ্গায় পরিণত হোল। কিন্তু জনতা ট্রাম পুড়িয়ে, মদের দোকান চুরমার করে অভ্যর্থনাকারীগণকে প্রহার করে তাণ্ডব বাধিয়ে দিল।

প্রিন্স ২৪ শে ডিসেম্বর কলকাতায় আগমন করলেন। শহরে সেদিন পরিপূর্ণ হরতাল হোল। বিশাল কলিকাতা মহানগরী সেদিন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ নিরাভরণ বেশ ধারণ করেছিল। দোকান পশার বন্ধ, সমস্ত যান বাহন, এমন কি ট্রাম পর্য্যন্ত বন্ধ। রাস্তা জনমানব শূন্য। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই অবস্থা অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় যেন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং ক্যালকাটা ইয়োরোপীয়ান এসোসিয়েশন গভর্ণমেণ্টকে কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে দিল। গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধরপাকড়, গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড আরম্ভ করে দিলেন। পণ্ডিত মতিলাল, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মিঃ এস্ ই ষ্টোকস প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং হাজার হাজার কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। কলকাতায় দেশবন্ধুর বহু সহকর্ম্মী অনুচর এবং হাজার হাজার কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়ে গেলেন। মফঃস্বলের সমস্ত জেলায় জেলায়ও কারাদণ্ডের হিড়িক পড়ে গেল।

যখন চারিদিকে গ্রেপ্তারের হিড়িক আরম্ভ হোল সেই সময়ে

শরৎচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন "ওহে হেমন্ত, জেলখানাতে আফিম খেতে দেয়!

হেমন্ত সরকার বল্লেন, "আজ্ঞে না।"

"তামাক খেতে দেয়?"

"আজ্ঞে তাও দেয় না।"

"তবে বাপু আমার জেলে যাওয়া হবে না।"

দেশবন্ধু হেসে বল্লেন, "কি রকম?"

শরৎচন্দ্র বল্লেন "আরে দূর দূর। জেলখানাটা মোটেই দেখছি ভদ্রলোকের স্থান নয় ও আমার পোষাবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি একটা গুলি গোলা চালিয়ে দেয় তার মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু ঐ ভেড়ার গোয়ালে বসে বসে দিনরাত্রি কড়ি কাঠ গুণে গুণে মাসের পর মাস কাটান আমার দ্বারা হবে না।"

শরৎচন্দ্র জেলে গেলেন না, কিন্তু কংগ্রেসের কাজ সমানে করে যেতে লাগলেন। সে সময়ে কংগ্রেস "ভলাণ্টিয়ার কোর্" বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। যাঁদের নাম কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার লিষ্টে প্রকাশ করা হোত বা যাঁরা বে-আইনী ঘোষিত (banned) জনসভাতে যোগদান করত তাঁরাই গ্রেপ্তার হতেন। সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তখন ১৯৩০-৩২-এর, ১৯৩৮ ও ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময়ের মতন বে-আইনি ঘোষিত হয়নি। সুতরাং শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের কাজ করে যেতে লাগলেন, কিন্তু গ্রেপ্তার হলেন না। তিনি বল্লেন "আমি সেজে গুজে আমাকে ধর-ধর ভঙ্গী করে জেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াব না। কাজ করতে করতে এমনি ধরে নিয়ে যায়, যাবে, কিন্তু জেলে যাবার জন্য জেলে যাবনা।"

ডিসেম্বরের শেষে আহমাদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হোল। সেবার কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ হওয়াতে হাকিম আজমল খাঁ সভাপতিত্ব করলেন। কংগ্রেসে কার্যাত একটি মাত্র প্রস্তাব পাশ হ'ল। অসহযোগ প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করল এবং ঐ আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করল। স্থির হোল, প্রথমে গুজরাটের বারদৌলী তালুকে গভর্ণমেণ্টের খাজনা বন্ধ করা হবে এবং ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে গভর্ণমেণ্টের খাজনা বন্ধের আন্দোলন ব্যাপ্ত করা হবে।

একদিকে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি পূর্ণ বেগে চলতে লাগল, অন্যদিকে আন্দোলন আরম্ভ করবার আয়োজনও তীব্র গতীতে অগ্রসর হতে লাগল। সমগ্র ভারতে প্রায় পঁচিশ হাজার কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হোল। দেশের সর্ব্বপ্রান্তে সর্ব্বরন্ধ্রে বিপ্লবের ঘূর্ণী হাওয়া যেন এক প্রলয় তাণ্ডবের সূচনা আনছে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দিশেহারা বিহ্বল কম্পমান হয়ে পড়েছে। মহাত্মাজীর একটি ইঙ্গিতে যখন ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে এক সঙ্গে বিপ্লবের ডমরু বিষাণ বেজে উঠবে, এই অবস্থায় ঠিক সেই সময়ে, ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনাতে সমস্ত ওলটপালট হয়ে গেল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে থানার পাশ দিয়ে জনসাধারণের একটি মিছিল যাচ্ছিল। থানায় কনষ্টবলদের সঙ্গে মিছিলকারীদের বচসা হয়। বচসা ক্রমে কলহে পরিণত হয় এবং সিপাহীরা মিছিলের উপর গুলি চালায়। মিছিলকারীরা সিপাহীদের পালটা আক্রমণ করে। সিপাহীদের গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা দৌড়ে থানার ভিতরে গিয়ে

আশ্রয় নেয়। মিছিলকারীরা তখন থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তখন সিপাহীরা প্রাণের দায়ে প্রজ্জ্বলিত ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং উত্তেজিত জনতা সেই সময়ে সিপাহীদের ধরে কেটে টুকরো টুকরো করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে।

এই ঘটনাতে মহাত্মাজী মর্ম্মাহত হন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভারত সম্পূর্ণরূপে অহিংসভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করবার মত প্রস্তুত হয়নি। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন করবার মত সময় এখনও আসেনি। তিনি আরও আশঙ্কা করলেন যে, আইন অমান্য আরম্ভ করলে হয়ত অনেক স্থানেই এইরূপ হিংসা প্রকট হয়ে উঠবে। তিনি এই ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পাঁচ দিন প্রায়োপবেশন করলেন। মহাত্মাজী এই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে তার নেতৃত্ব করবার জন্য বারদৌলীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই প্রত্যাসন্ন আন্দোলন ত স্থগিত করে দিলেনই, উপরন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বারদৌলীতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকে সেই মিটিংএ সমগ্র দেশের আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করবার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে দেশের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ অহিংস আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য এবং তাঁত চরখা প্রচলন, খদ্দর প্রস্তুত, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রভৃতি গঠন-মূলক কাজ, এবং কংগ্রেসের সভ্য-সংগ্রহ ও কংগ্রেসের কাজের জন্য তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করবার জন্য উপদেশ দেওয়া হোল।

যে উত্তাল উদ্দাম যৌবন তরঙ্গ ভারতবর্ষকে তোলপাড় করছিল

মহাত্মাজী তাকে এক গণ্ডুষে শোষন করে ফেললেন, নিজের সৃষ্ট আন্দোলন নিজেই সংহৃত করে ফেললেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাঁর নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করে সমগ্র ভারতের আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলনকে সংবরণ করে দিল। এক মুহূর্ত্তেই প্রভঞ্জন-সংক্ষুব্ধ ভারত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রল। মহাত্মার এই আন্দোলন প্রত্যাহার ইতিহাসে বারদৌলী হল্ট (Bardoli halt) নামে খ্যাত হয়েছে। বারদৌলী হল্টের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের চতুর্দ্দিকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোল। লোকের মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। আশা উৎসাহ উদ্দীপনার স্থানে জনগণের মন বিষাদ ও নিরাশায় পূর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে মহাত্মাজীর প্রভাবও অনেক কমে গেল। এতদিন গভর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বত্র সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও হাজার হাজার কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করলেও, আন্দোলনের প্রধান নেতা ও স্রষ্টা মহাত্মাজীকে স্পর্শ করতে সাহস করেনি। কারণ জনগণের ভিতর মহাত্মাজীর এক অচিন্তনীয় প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছিল, কোটি কোটি লোক তাঁকে অতি মানব এমন কি অবতার বলে পর্য্যন্ত ধারণা করতে আরম্ভ করেছিল। এই কারণে এতদিন গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করেনি। তাঁকে স্পর্শ করলেই চতুর্দ্দিকে এক বিরাট বিপ্লব ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যাবার বিশেষ আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এখন মহাত্মাজীর সেই অলোকসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তি যেই কমে গেল, ও জনগণের মনের আশা ও উদ্দীপনা নিভে গেল, অমনি লর্ড রিডিংএর গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীকে, গ্রেপ্তার করে ফেলল। ১০ই মার্চ্চ তারিখে মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হলেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে

দণ্ডিত হলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বের এইখানেই যবনিকা পতন হোল।

বারদৌলী হল্টের ফলে সমগ্র ভারতের কংগ্রেস কর্ম্মীদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা করে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন "Many workers were dissatisfied with the suspension of civil disobedience and the constructive programme which chalked out a course of quiet unostentatious work of organisation and consolidation of the national resources was regarded by many as throwing a wet blanket on the fire and fervour of the people."

বারদৌলী হল্টের পরে আমি (বর্ত্তমান লেখক) ও কুমিল্লার সুবোধ মজুমদার (কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বসন্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র) একদিনে এক সঙ্গে জুভেনাইল জেল থেকে ছাড়া পেলাম। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অনেক দিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম বারদৌলী হল্টে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছেন। তাঁ'র মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বল্লেন, "মহাত্মাজী ভয়ানক ভুল করলেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখা মানে টুটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটান। Mass revolution একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। এ মুভমেণ্ট আর রিভাইভ করবে না।" এই সময়ে প্রায়ই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। দেশবন্ধু তখনো জেলে। তাঁর সহকর্ম্মীরাও সব জেলে, শরৎচন্দ্র প্রায় নিঃসঙ্গ, মাঝে মাঝে তিনি মানসিক যন্ত্রণায়

অধীর হয়ে ছট ফট করতেন। উত্তেজিত অবস্থায় কখনো বা ইজি-চেয়ারে বসে ঘন ঘন গড়গড়ার নলে প্রবল টান দিতেন। তাঁর মনে খুব আশা হয়েছিল যে, ঐ আন্দোলনে ভারতের স্বরাজ লাভ হবেই হবে, কিন্তু এখন সেই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে তাঁর মন একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বল্লেন "দেখ, ভেবেছিলুম এই আন্দোলনে স্বরাজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তা মহাত্মাজী আন্দোলন আরম্ভই করলেন না।"

কী গভীর বেদনা যে তখন তাঁর সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছিল! চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠল। বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়গড়ার নলটি তুলে মুখে দিলেন। ক্ষণেক পরে সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠে গড়গড়ার নলটি লাঠির মতন শূন্যে প্রসারিত করে বলে উঠলেন "গোটা কতক কনষ্টেবল Infuriated mob এর হাতে পুড়ে মরেছে; তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে— সেই শোনিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গেল। সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বল্লেন, "নন ভায়ওলেন্স খুব noble idea কিন্তু Achievement of freedom is nobler— hundred times nobler."

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। বল্লুম আজ আসি। শরৎচন্দ্র তাঁর ইজি-চেয়ারটাতে শুয়েই রইলেন, অন্যদিনের মত বারান্দার সিঁড়ি অবধি এসে সস্নেহে এগিয়ে দিয়ে গেলেন না। বাহিরে গোধূলীর আবছা

অন্ধকার নেমে আসছে। তিনি অন্তরের গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেই চেয়ারটার উপরে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

মহাত্মাজী চৌরীচৌরার ঘটনার জন্য পাঁচ দিন অনশন পালন করেন—দুষ্কৃতকারীদের হিংস্রতার নৈতিক দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে' তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) তারিখে তিনি বারদৌলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা ডেকে তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারদৌলী হল্ট বা আইন-অমান্য স্থগিত-প্রস্তাব পাস করালেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করে' সেই সভার সম্মুখে অনুমোদনের জন্য আইন-অমান্য স্থগিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই সভাতে সভ্যদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। অনেকে আইন-অমান্য স্থগিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রীয় সদস্যগণ ওয়ার্কিং কমিটির বারদৌলী প্রস্তাবের নিন্দা করে' এবং আইন-অমান্য আন্দোলন স্থরু করার স্থপারিশ করে' এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন ; কিন্তু এই সংশোধক প্রস্তাব ও অন্যান্য সদস্যগণের বিরোধিতা কার্য্যকরী হল না। বহুসংখ্যক সদস্যের মেজরিটিতে বারদৌলী প্রস্তাব—অর্থাৎ আইন-অমান্য-স্থগিত প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাতে অনুমোদিত হয়ে গেল। মহাত্মাজীর সিদ্ধান্তই কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর অব্যবহিত পরেই

মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হলেন এবং ১০ই মার্চ্চ তারিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলে অবরুদ্ধ হলেন। চল্লিশ কোটি নরনারীর বিদ্রোহী নেতা—সাত লক্ষ গ্রামে যিনি বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন—নিজেই আবার তাকে নির্ব্বাপিত করে দিয়ে সহ-অভিযুক্ত শিষ্য শঙ্কর লাল ব্যাঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ারবাদা জেলখানার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। জেলখানার বিরাট্ ফটক উন্মুক্ত হ'ল। মহাত্মাজী অটল অবিকম্পিত পদক্ষেপে জেলখানার সিংহদ্বার অতিক্রম করে' তার জঠরে প্রবেশ করলেন। ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল। তারই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রত্যাসন্ন গণবিপ্লবের উপরও যবনিকা পড়ল।

দাবানল নির্ব্বাপিত হল বটে, কিন্তু উত্তাপ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রশমিত হল না। আগুন আর জীবনের ধর্ম্মই বুঝি তাই। নির্ব্বাণের পরেও এদের উত্তাপ পশ্চিমাকাশে রক্তিমাভার মতই বুঝি বা প্রতীক্ষা করতে থাকে—যদি অগ্নি আবার ফিরে আসে।

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিত্যক্ত হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বটে, কিন্তু ভারতব্যাপী বহু কর্ম্মীর মন তাতে সায় দিল না। তাদের মনে একটা চাপা বিক্ষোভ আর অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগ্‌ল। পুনরায় যখন ৭ই জুন তারিখে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল, সেই সভাতে বহু সদস্য আইন-অমান্য আন্দোলন পুনঃপ্রবর্ত্তন করাবার জন্যে জিদ করতে লাগলেন। এদের আগ্রহাতিশয্যের দরুণ নিখিল ভারত কংগ্রেস এই অধিবেশনে আইন-অমান্য অনুসন্ধান কমিটি (Civil Disobedience Enquiry Committee) নামে একটি

সাব্‌কমিটি গঠন করে' তাঁদের ওপরে ভার দিলেন যে, তাঁরা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করে' ও অনুসন্ধান করে' রিপোর্ট দেবেন যে, ভারতবর্ষ আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি না ?

আইন-অমান্য অনুসন্ধান কমিটি যখন দেশময় ভ্রমণ করে' বেড়াচ্ছেন, সেই সময়ে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। আইন-অমান্য অনুসন্ধান কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন যে, দেশ গণ-আইন-অমান্যের (Mass Civil Disobedience) জন্য প্রস্তুত নয়। ওদিকে দেশবন্ধুও মুক্তিলাভ করার পর থেকেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে নূতন রূপ দেবার জন্যে তাঁর কাউন্সিল প্রবেশ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেন। পূর্ব্ব বৎসর দেশবন্ধু আহমদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন ; কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই তিনি গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হলে, তাঁর বদলে হাকিম আজমল খাঁ আহমদাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। এ বৎসর গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

দেশবন্ধু যখন দেশের ও কংগ্রেসের সম্মুখে তাঁর কাউন্সিল প্রবেশের প্রোগ্রাম উপস্থাপিত করলেন, সবাই বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠল। চতুর্দ্দিকে একটা ভয়ানক অপ্রত্যাশিত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। প্রায় সমগ্র কংগ্রেস এবং সমগ্র দেশই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এই ধারণা সকলের মনে জন্মাল যে, যে কাউন্সিল নন-কো-অপারেশন করে বয়কট করা হয়েছে, সেই কাউন্সিলে প্রবেশ করলে নন-কো অপারেশন নীতিকেই পরিত্যাগ করা হবে ও কো-অপারেশনের রাস্তাতেই অগ্রসর হওয়া হবে। দেশবন্ধু বোঝালেন, "না, তা হবে না।

আমরা কাউন্সিলে প্রবেশ করব—গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কো-অপারেশন করবার জন্য নয়, নন-কো-অপারেশন করবার জন্যই। সেখানে গিয়ে আমরা গভর্ণমেণ্টের ভাল-মন্দ নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে সেগুলিকে বাতিল করব। আমরা সেখানে নিজেরাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করব না এবং বাজেটে মন্ত্রীর বেতন পাস করাতেও দেব না। এইরূপে সমগ্র জগতের কাছে দেখাব যে, ভারতবর্ষ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার গ্রহণ করে নি। তা' ছাড়া মন্ত্রিমণ্ডলীর বেতন নামঞ্জুর করে' ও তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়ে আমরা দ্বৈত শাসননীতি (Dyarchy) অচল করে' দেব। এ প্রোগ্রাম কো-অপারেশনের রাস্তা নয়, নন-কো-অপারেশনেরই রাজপথ।”* কিন্তু সেদিন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভিন্ন কেউ তাঁর কথা শুনলেন না, সকলেই তাঁকে ভ্রান্ত মনে করলেন।

শরৎচন্দ্র গোড়া থেকেই দেশবন্ধুর এই নূতন পরিকল্পনাকে আন্তরিক সমর্থন দিলেন। শুধু যে এই প্রোগ্রাম সমর্থন করলেন তাই নয়, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেন যে, বারদৌলী হল্টের দ্বারা দেশ যে নিষ্ক্রিয়তা, হতাশা ও পরাজিত মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তা' থেকে দেশকে বাঁচিয়ে আবার সঞ্জীবিত করে' তুলতে হলে এই সক্রিয় প্রোগ্রামই একান্ত দরকার। চারিদিকের বিরোধিতার তাণ্ডবের এবং অপ্রিয় সমালোচনা ও অশিষ্ট আক্রমণের আপৎকালে তিনি দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, “কিছু ভাববেন না আপনি। এই ত আপনার পথ! যে সত্য আপনি একান্তমনে উপলব্ধি করেছেন, নিঃসঙ্কোচে তাকে প্রচার করুন।”

দেশবন্ধু কৌতুক করে' বল্লেন "সবাই যে বিপক্ষ শরৎবাবু!"

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন, "হোক সবাই বিপক্ষ। সবাইকার মত আপনার জন্য নয়। আপনার মতই সবাইকার জন্য।" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থেকে আবার তিনি বলে' উঠলেন, "লোকে শুনছে না? শুনবেই না ত! লোকে ত কোন দিনই সত্যের বাণী প্রথমে শোনে না। রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের বিধান লোকে শুনেছিল? নেপোলিয়ান যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, লোকে শুনেছিল? আপনার কথাও লোকে আজ শুনছে না—কিন্তু শুনবে। কাল শুনবে, পরশু শুনবে, নিশ্চয়ই শুনবে।"

দেশবন্ধু গয়া কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে কাউন্সিলপ্রবেশ প্রোগ্রাম উপস্থাপিত করলেন। সমগ্র কংগ্রেসমণ্ডপ আপত্তি ও ধিক্কারের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। যে মুষ্টিমেয় ডেলিগেটবৃন্দ দেশবন্ধুকে সমর্থন করলেন, তাঁদের নাম হল প্রো-চেঞ্জার; আর যাঁরা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না করে' সেইগুলিকেই আঁকড়ে থাকতে চাইলেন, তাঁদের নাম হ'ল নো-চেঞ্জার। গয়া কংগ্রেসে নো-চেঞ্জারদের সংখ্যা হ'ল বিপুল আর প্রো-চেঞ্জারদের সংখ্যা হ'ল মুষ্টিমেয়। নো-চেঞ্জারদের মুখপাত্র এবং নেতা হয়ে দেশবন্ধুকে পরাজিত করলেন মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারী। এই মুণ্ডিতমস্তক, শিখোপবীতধারী, শীর্ণকায় দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের মত সুপণ্ডিত, প্রতিভাশালী, কুশাগ্রবুদ্ধি নেতা সমগ্র কংগ্রেসে খুব কমই ছিলেন এবং আজও আছেন।

গয়াতে হেরে কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু বল্লেন, "আমি

জিত্‌বই, দেশ আমার প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই নেবে।" শরৎচন্দ্র এবিষয়ে দেশবন্ধুর সহিত সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। তিনি বল্লেন, "আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন, দেশ আপনার প্রোগ্রাম ভাল করে' বুঝতে পারলেই তা' গ্রহণ করবে। গয়াতে কংগ্রেস আপনার প্রোগ্রাম ভাল করে' বোঝেনি, বিবেচনা করেনি; তাই আপনি হেরে গেছেন, কিন্তু দেশ শীঘ্রই আপনাকে বুঝতে পারবে।"

দেশবন্ধু প্রবল উদ্যমে তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করলেন। তাঁর অনুগত অনুচরগণ বাংলাদেশে প্রচার চালাতে লাগলেন। দেশবন্ধু নিজে গেলেন বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে। প্রথমেই তিনি গেলেন মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারীর দেশে। মাদ্রাজ তিনি জয় করলেন। একে একে সমস্ত প্রদেশ ভ্রমণ করে', বক্তৃতা করে', সমস্ত ভারত জয় করে' বীরবেশে তিনি ফিরে এলেন।

বাংলা দেশেই দেশবন্ধু পেয়েছিলেন সবচেয়ে তীব্র ও প্রচণ্ড বাধা। বাংলা দেশের সবগুলি সংবাদপত্র তাঁর বিপক্ষে। বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, সার্ভেন্ট প্রভৃতি প্রভাবশালী কাগজগুলি দিনের পর দিন তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে লাগল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তাঁর বিপক্ষে। তখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সম্পাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উভয়েই নো-চেঞ্জার। কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির প্রায় সকল সদস্যই নো-চেঞ্জার। এঁরা সকলেই প্রবল বিক্রমে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে লাগলেন। সে কি দুর্দ্দিন দেশবন্ধুর! হাতে টাকা নেই, স্বপক্ষে কাগজ নেই, দলে মুষ্টিমেয় লোক। বালখিল্যের মত নগণ্য লোক যারা, তারাও সকালে সন্ধ্যায় তাঁকে গালাগাল না দিয়ে জল

খায় না। শরৎচন্দ্র নীরবে তাঁর পশ্চাতে শুভ প্রেরণা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা হল; দেশবন্ধু সদলে গেলেন। শরৎচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। সভাতে দেশবন্ধু অনুচরগণ সহ সাধারণ সদস্যদের আসনে গিয়ে বসলেন। কেউ তাঁকে মঞ্চে গিয়ে নেতাদের আসনে বসবার জন্যও অনুরোধ পর্য্যন্ত করল না। ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সভাপতি। দেশবন্ধু সভাপতিকে একটা ruling সম্বন্ধে কি বলতে উঠলেন, শ্যামবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "I won't hear that man."

দেশবন্ধুর চোখ দু'টো অভিমানে জ্বলে' উঠল। তিনি বল্লেন, "শ্যামবাবু, আমি অনেকদিন ব্যারিষ্টারী করেছি. কখনও হাইকোর্টের কোন জজ আমাকে বলতে পারেন নি যে, তিনি আমার কথা শুনবেন না; আর আজ আপনি বল্লেন!" শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "শ্যামবাবু, আপনি দেশবন্ধুকে "That man" বল্লেন, "That gentleman" পর্য্যন্ত বলতে পারলেন না?" শ্যামবাবু উত্তেজিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে বল্লেন, "I can't stand your face."

শরৎচন্দ্র অপমান সহ্য করতে পারতেন না। রাজনীতি করতে হলে যে পরিমাণ মোটা চামড়া (Thick skinned) হওয়া দরকার, শরৎচন্দ্র সেরূপ ছিলেন না। রাগে গরগর করতে করতে তিনি সভা ত্যাগ করে' বেরিয়ে চলে' গেলেন।

বাসায় ফিরে দেখা গেল—শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় কেবল পায়চারী করছেন। দেশবন্ধু সদলবলে গৃহে প্রবেশ করামাত্র শরৎচন্দ্র ছুটে এসে আলিপুর বোমার মামলার প্রসিদ্ধ আসামী দ্বীপান্তর-ফেরতা শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে' একটা ঝাঁকানী দিয়ে

বলে' উঠলেন, "উপীন, তুমি ত ভাই বোমা পার্টির লীডার ছিলে, আমাকে একটা বোমা তৈরী করে' দিতে পার ?"

দেশবন্ধু সহ সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। উপেনদা জিজ্ঞাসা করলেন "বোমা—কি করবেন ?"

"ঐ শ্যাম্ চকোত্তির মাথায় ছুঁড়ে মারব। আমাকে বলে কিনা, 'I cant stand your face !' আরে বাবা, বারেন্দো বামুন ! বামুনের মধ্যে বারেন্দো, আর রোগের মধ্যে—"

প্রচণ্ড হাসির কোরাসে ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। দেশবন্ধু অবধি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র দারুণ ক্রোধে দেশবন্ধুকে বল্লেন "হাসছেন ? আপনি শুদ্ধু হাসছেন ! আমাকে এমন করে' অপমান করলে, তবুও হাসি আসছে আপনার ? যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানী হতে হয়, তাতে আর আমি নেই—I have had enough of it and I would have none of it any more."

দেশবন্ধু সস্নেহ হাস্যে শরৎচন্দ্রের একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লেন "তাই করুন, শরৎ বাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ ; আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে' দিন।"

শরৎচন্দ্র একখানি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। গড়গড়া তৈরী ছিল, সটকায় গোটা দুই টান মেরে' বল্লেন "কিন্তু কি করে' ছাড়ি !!"

সহসা কণ্ঠে যেন তাঁর বেদনা শতধারে ফেটে পড়ল ; নয়ন সজল হয়ে উঠল। বুকের গভীর তলদেশ থেকে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে'

তিনি বল্লেন, "আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা-বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কি করে? আমাদের ব্যথা ত নিতান্তই সামান্য, উপমা দিতে হলে হয়ত গোষ্পদই বলা চলে, কিন্তু আপনি যে দুঃখের মহার্ণব হয়ে রয়েছেন। নাঃ, আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না!"

প্রবল টান দিতে লাগলেন তিনি সটকাতে—পড়্-পড়্ পড়্-পড়্।

গয়ার পরাজয়ের নয় মাসের মধ্যেই দেশবন্ধু দিল্লী স্পেশাল কংগ্রেসে জয়লাভ করলেন। এই অত্যাল্প কালের মধ্যেই তিনি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে নিজমত প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন এবং সকল প্রদেশের কংগ্রেস ডেলিগেটদিগের সাহায্যে স্পেশাল কংগ্রেস দাবী করলেন। কাউন্সিল প্রবেশ নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল এবং সেখানে দেশবন্ধুর নীতি কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে অনুমোদিত হল। কাউন্সিল প্রবেশ নীতি কার্য্যকরী করবার জন্যে কংগ্রেস স্বরাজ্য দল গঠিত হল। দেশবন্ধু স্বয়ং এই দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, বিঠলভাই প্যাটেল, এম আর জয়াকর, তরুণরাম ফুকন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, অভয়ঙ্কর প্রভৃতি শক্তিমান নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বরাজদলে যোগদান করলেন। দেশবন্ধু ঝটিতি সমগ্র ভারতবর্ষে স্বরাজদল গঠন করে সর্ব্বত্র কাউন্সিল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নবীন উৎসাহের বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ হয়ে গেল।

দিল্লী কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ নীতি অনুমোদিত হবার পরে বাঙ্গলা দেশে কাউন্সিল নির্ব্বাচনের আর দেরী ছিল না। নির্ব্বাচন তখন আসন্ন। তিন সপ্তাহের মধ্যে দেশবন্ধুকে বাঙ্গলা দেশে দল গঠন করে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ফেলতে হয়েছিল। ভাববার সময় ছিল না। অপেক্ষা করবার অবসর ছিল না। সুশৃঙ্খল এবং বিচক্ষণ আয়োজনের সুযোগ ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্ত তখন মূল্যবান। দেশবন্ধু সকল কেন্দ্রে আপন অনুচরগণকে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলেন। শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বিরুদ্ধে তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত অনুচরগণকে দাঁড় করিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না।

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যেমন ফ্রান্সের গ্রাম্য বালিকা যোয়ান অব আর্ক স্বদেশের স্বাধীনতার অভিযানে ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আক্রমণকারী দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে পতাকাহস্তে অকুতোভয়ে এক দুর্ব্বার উণ্মাদনায় যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং একের পর এক যুদ্ধ জয় করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই রকম ঐশী প্রেরণা দুর্ব্বার উণ্মাদনা এবং অচিন্ত্যণীয় আত্মবিশ্বাস সেদিন প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম দেশবন্ধুর মধ্যে।

দেশবন্ধু নিজের সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে ব্যূহ রচনা করে নির্ব্বাচন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। যুক্ত করে তিনি দেশবাসী ও ভোটারগণের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর সে প্রার্থনায় দেশের জনসাধারণের চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু বুদ্ধিমান বিজ্ঞ সমালোচকদের কলরব মুখর হয়ে উঠল। তাঁরা বহুবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে লাগলেন। দেশবন্ধুকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে লাগলেন তোমার মনোনীত প্রার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা কতখানি?

কাউন্সিলে জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার মত ব্যক্তিত্ব মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা তাদের কৈ ?

অভিমানে দেশবন্ধুর চোখ জ্বলে উঠল। এই সমস্ত সমালোচনার উত্তরে তিনি বজ্র নির্ঘোষে বলে উঠলেন "Vote for the lamp post."

প্রচণ্ড তরঙ্গের ধাক্কায় যেমনি করে ঐরাবত ভেসে গেছল সমস্ত সমালোচনা বিরুদ্ধতাও সেদিন বাঙ্গলা দেশের জনমতের ধাক্কায় তেমনি করে ভেসে গেল। দেশবন্ধুর নগণ্য প্রার্থীদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠাবান ক্ষমতাবান অর্থবান কুলে শীলে বিদ্যায় যোগ্যতায় মর্য্যাদায় উঁচু উঁচু ভারী ভারী জাঁদরেল মডারেট প্রতিদ্বন্দ্বীবৃন্দ কচুকাটা হয়ে গেলেন।

দেশবন্ধু যখন সকল নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন "শরৎ বাবু আপনি হাওড়া থেকে দাঁড়ান।" দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন তাঁদেরও খুবই ইচ্ছা যে শরৎচন্দ্র যেন হাওড়া কেন্দ্র হতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু শরৎচন্দ্র হেসে দেশবন্ধুকে বললেন "আপনি ক্ষেপেছেন ? আমি দাঁড়াব কাউন্সিল ইলেক্‌সনে ?

দেশবন্ধু বললেন কেন দাঁড়াবেন না ?

"না না, দূর দূর, সে কি হয় ? আমি সামান্য গ্রন্থকার মানুষ, আমি কি কাউন্সিল ইলেক্‌সানে দাঁড়াবার যোগ্য ? লোকে বলবে কি ?"

দেশবন্ধু সবিস্ময়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন "আপনি কি বলছেন শরৎ বাবু ?"

শরৎচন্দ্র স্মিতমুখে বললেন "ঠিক বলছি। দেশের জন্য আমি কি করেছি? আমি জেলে যাইনি, ওকালতী ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিনি, দেশের জন্যে আমি ত কোন নির্য্যাতন বরণ কোন ত্যাগ স্বীকারই করিনি। আপনি আমাকে ভালবাসেন—সে আপনার আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আপনি নিজে কবি সাহিত্যিক, আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে ভালবাসেন। বন্ধুত্বের জন্যে আমি আপনার প্রিয়জন হতে পারি কিন্তু দেশের লোক আমাকে প্রিয়জন মনে করবে কেন? তাছাড়া আমার নিজের সামান্য সাহিত্য সাধনাকে আমি রাজনীতির মূলধন করতে চাই না। বিশেষতঃ কাউন্সিলের যা কাজ—ইংরাজী বক্তৃতা শোনা আর ইংরেজী বক্তৃতা দেওয়া, দুটোতেই আমার অত্যন্ত অরুচি। আপনি আমাকে রেহাই দিন। এমন কাউকে দাঁড় করান লোকে যাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে। আপনার এমনিই বাধা বিপত্তি অসুবিধার অন্ত নেই, তার উপরে ভোটারদের উপরে আপনার নিজের liking চাপিয়ে দিয়ে বাধা বিপত্তি আর বাড়াবেন না।"

শরৎচন্দ্র ক্যাণ্ডিডেট হতে রাজী হলেন না। যে বস্তু লাভ করার জন্য ত্যাগী দেশ সেবকদের কতই লালায়িত হতে দেখেছি, যার জন্যে কত খোসামোদ কত তদ্বির কত রেষারেষি মন কসাকসি কত দল উপদল ক্লিক কোটারির সৃষ্টি, সে বস্তুতে শরৎচন্দ্রের কোনদিন কোন আসক্তি ছিল না। এ নিরাসক্তি ছিল তাঁর চরিত্রগত, প্রকৃতিগত। ইলেকসানে ক্যাণ্ডিডেট তিনি কোনদিন হতে চাননি। কোনদিন কিছুতেই তাঁকে রাজী করান যায়নি।

এর পরেও তাঁকে কংগ্রেস থেকে ক্যাণ্ডিডেট করবার প্রস্তাব

কয়েকবার উঠেছিল। যখন তাঁর জনপ্রিয়তার কোন সীমা কোন পরিমাপ্ ছিল না, যখন বাঙ্গলার যুবজনচিত্তে বৃন্দাবনের রাখাল রাজের মত প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তখনো তিনি ইলেকসানে দাঁড়াতে রাজী হননি। রাজী হলে তিনি কাউন্সিল এ্যাসেমব্লীর মেম্বার ও হাওড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বিনা চেষ্টায় ঘরে ঘুমুতে ঘুমুতে হতে পারতেন। কিন্তু কোন দিন তিনি তা চান নি, কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

শরৎচন্দ্র রাজী না হওয়াতে দেশবন্ধু তখন হাওড়া থেকে উকিল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীকে স্বরাজ পার্টির পক্ষ থেকে দাঁড় করালেন। খগেন বাবু নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রথম বারকার নির্ব্বাচনে দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র দুজনের কেহই নির্ব্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। অথচ স্বরাজ পার্টির কাজে দুইজনেই যেমন করে সমস্ত দেহ মনের সেবা ও শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন, খুব কম লোকেই তেমন করে কাজ করেছেন।

স্বরাজ পার্টি গঠিত হবার পরে শরৎচন্দ্র স্বরাজ পার্টি এবং দেশবন্ধুর কাজে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময়ে দেশবন্ধুর অজস্র বাঙ্গলা বিবৃতি শরৎচন্দ্র রচনা করে দিয়েছেন। নানাভাবে তিনি স্বরাজ পার্টি ও দেশবন্ধুর কাজে সাহায্য করেছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে দরদের সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য কাজ করেছেন। কিন্তু নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না, নিজেকে প্রচার করতেন না। কাজের আনন্দে কাজ করে যেতেন, কোন পুরস্কার কোন বাহবা কোন পরিচয় চাইতেন না। দেশবন্ধু যখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন তখনো তিনি দেশবন্ধুর কাজে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। চাঁদাতোলা কার্য্যে শরৎচন্দ্রের বিশেষ রুচি ছিলনা, তথাপি দেশবন্ধু যখন বাঙ্গলাদেশে পল্লী সংগঠনের কাজের জন্য দেশের কাছে তিন লক্ষ টাকা প্রার্থনা করলেন তখন শরৎচন্দ্র চাঁদা তোলার কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আবার দেশবন্ধু যখন তাঁর দৈনিক পত্রিকা Forward বার করবার জন্য শেয়ার বিক্রী করিয়েছিলেন তখনো শরৎচন্দ্র শেয়ার বিক্রয়ের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন।

আর একটি সাহায্য দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের কাছে নিয়ত পেয়েছেন যা তিনি আর কারো কাছেই পাননি। সহকর্ম্মীদের সকলেই ছিলেন দেশবন্ধুর শিষ্যপ্রতিম, বন্ধু ছিলেন একমাত্র শরৎচন্দ্র। আঘাতে আঘাতে যখন প্রাণ ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠত, বাধা বিপত্তির বেড়াজালে আটকে মন যখন হাঁপিয়ে উঠত, ক্লান্তি অবসাদ ও নিরাশায় যখন কাতর হয়ে পড়তেন, তখন তাঁকে মন প্রাণের ব্যথামোচন করে উৎফুল্ল করে তুলবার একমাত্র সুহৃৎ ছিলেন শরৎচন্দ্র। সমবেদনা দিয়ে, আশাভরসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সরস পরিহাস দিয়ে দেশবন্ধুর রণক্লান্ত বিষণ্ণ মনকে শরৎচন্দ্র সজীব করে তুলতেন। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর মনের রসায়ন।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা পরলোকগত স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ, দুজনের ঘটল মতবিরোধ। দুজনে ভীষণ ঝগড়া করতে লাগলেন ও নিয়ত দেশবন্ধুর কাছে এসে উভয়েই তাঁকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে লাগলেন। দেশবন্ধু উভয়ের মধ্যে

মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সফল হতে পারলেন না। তুই সন্ন্যাসীর স্বাত্ত্বিক ক্রোধ ও কলহ কিছুতেই প্রশমিত হল না। দেশবন্ধুর প্রাণ ঝালাপালা হয়ে উঠল। একদিন সকালে উভয়েই তাঁর বাড়ীতে এসে হুহুঙ্কার আরম্ভ করে দিলেন। সেদিন সকালে শরৎচন্দ্রও এসেছিলেন। তুই সন্ন্যাসীর কলহ ও চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশবন্ধু কাতরভাবে বললেন—"প্রাণ যে আমার গেল শরৎ বাবু!"

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন 'যাবেই ত!'

দেশবন্ধু বিস্মিতনেত্রে তাঁর দিকে চাইতেই শরৎচন্দ্র গম্ভীর ভাবেই বললেন 'মশাই, তুই স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতলেই মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়, আর আপনি তুই স্বামী নিয়ে ঘরকন্না আরম্ভ করেছেন, আপনার প্রাণ যাবে না?' সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, এমনকি তুই স্বামীজি মহারাজও হাসতে লাগলেন।

শ্রীঅনিলবরণ রায় পরতেন খুব মোটা খদ্দরের লয়েন ক্লথ। অর্থাৎ একখানা চটের মতন খদ্দরের গামছা। বহর তার পড়ত হাঁটুর উপরে আর কাছাও আঁটা থাকত না। অধিকাংশ কর্ম্মীই মোটা খদ্দর পরতেন তখন, কিন্তু ৺শরৎচন্দ্র বসু পরতেন মিহি খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর। ৺শরৎবসু ছিলেন লম্বা চওড়া দশাসই মানুষ, তাঁর ধুতির বহর পড়ত পায়ের গোঁড়ালি পর্য্যন্ত লুটিয়ে, পাঞ্জাবির ঝুলও ছিল খুব লম্বা আর চাদরে থাকত মুগার পাড়। একদিন বৈঠকে জনৈক কর্ম্মী ৺শরৎবসুকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন "শরৎবাবু আপনার এ মিহি খদ্দর কোথাকার তৈরী?"

৺শরৎ বসু একটু উষ্মার সঙ্গে উত্তর দিলেন "ভাগলপুরের।"

এই বিদ্রুপের ফলে একটু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটবার উপক্রম হল। তখন শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন "ওহে আমাদের এখানে সব রকম আছে। একটু বৈচিত্র্য থাকা ভাল। অনিলবরণ হচ্ছে খদ্দরের মাদার টিংচার আর শরৎ হচ্ছে টু হান্‌ড্রেড ডাইলুশন বুঝলে?" হাসির চোটে অপ্রীতিকর আবহাওয়া নিমেষে উড়ে গেল।

দেশবন্ধু জীবনে সব চেয়ে বড় আঘাত পেয়েছিলেন মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ফরিদপুর কনফারেন্সে। তিনিই ছিলেন এই কনফারেন্সের সভাপতি। ডেলিগেটদের অধিকাংশই তাঁর দলের লোক, তাঁর শিষ্য ও অনুগামী। সভাপতির অভিভাষণে তিনি যখন তদানীন্তন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া লর্ড বার্কেন হেডের কংগ্রেসের প্রতি সহযোগীতার আহ্বানের উত্তরে মীমাংসার মনোভাব (Responsive gesture) প্রকাশ করলেন তখুনি তাঁর শিষ্যরা ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলেন। দেশবন্ধুর suggestion তাঁরা গ্রহণ করলেন না। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও প্রিয়তম শিষ্যরা পর্য্যন্ত তাঁর কথা গ্রহণ করলেন না। দেশবন্ধুর suggestion ধুল্যবলুণ্ঠিত হল। কনফারেন্স শেষ করে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

শিষ্যেরা কাণাঘুসা করতে লাগলেন "দেশবন্ধুর Dynamism শেষ হয়ে গেছে, তিনি মনে মনে মডারেট হয়ে গেছেন।"

প্রতিপক্ষগণ বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে বেড়াতে লাগলেন "সি আর দাশ প্রভিন্সিয়াল অটোনমি গ্রহণ করে গভর্ণর হবার লোভে পাগল হয়েছেন।"

হায়রে জনমত! কত অসার কত ভ্রান্ত কত যে নীচ হতে পারে সময়ে সময়ে এ বস্তু তার কোন কুল কিনারা নেই। পৃথিবীতে কত

ট্রাজেডী যে ঘটিয়েছে এই জনতার misunderstanding ইতিহাসের বুকে সে সব ক্ষতচিহ্নের কালো দাগ যুগে যুগে অধ্যায়ে অধ্যায়ে লেখা হয়ে আছে।

অভিমানে আর হতাশায় দেশবন্ধুর বুক ভেঙ্গে গেল। শরীর তাঁর অতিরিক্ত পরিশ্রমে আগেই ভেঙ্গেছিল, তার উপরে এই মানসিক আঘাত যেন অসহনীয় হয়ে পড়ল। একদিন জলভরা চোখের দ্যুতি বন্ধুর দুই চোখের উপরে ফেলে করুণ কণ্ঠে তিনি বললেন "শরৎবাবু, আমি মডারেট হয়ে গেছি, আমি গভর্ণর হতে চাই, এই হল শেষকালে বাঙ্গলাদেশের ধারণা ?"

শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে নিজের দুটি হাতের মধ্যে দেশবন্ধুর দুটি শীর্ণ কর-পল্লব গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে সেই শীর্ণ করযুগলে যেন প্রাণের সমস্ত আদর ঢেলে দিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বললেন "দুঃখ করবেন না। দুঃখকে নিজে গ্রহণ করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রায়শ্চিত্তের পথকে বন্ধ করবেন না। এ দুঃখ সঞ্চিত থাকুক সমস্ত দেশের জন্যে, সমস্ত জাতির জন্যে। মনে করুন অগ্নি পরীক্ষা ত সীতাকেই দিতে হয়েছিল। অসাধারণকেই যদি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে না পারে তাহলে আর তুচ্ছের তুচ্ছতা বজায় থাকে কি করে ? এ দুঃখ আপনি নেবেন না, রেখে যান আমাদের সকলের জন্যে।"

দু'জোড়া চোখ সেদিন পরস্পরের দিকে চেয়ে সজল হয়ে উঠেছিল। একজনের প্রাণ ভরা অভিমান আর একজনের হৃদয়ভরা সহানুভূতি যেন সেদিন গাঢ় চুম্বনে পরস্পরে মিশে গেল। একটি হৃদয় তার সমস্ত প্রেম আর আদর দিয়ে আর একটি হৃদয়ের কানায় কানায় ভরা বেদনাকে নিঃশব্দে শুষে নিতে লাগল।

বেশী কথা সেদিন তাঁদের হয়নি। কথার ছিলই বা কী? একজনের বিরাট বুকের মধ্যে অভিমানের বিশাল সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কি প্রচণ্ড ঝড় যে সেখানে বয়ে যাচ্ছিল তার কি কোন হদিস সেদিন কেউ পেয়েছিল? হরিশ্চন্দ্রের মত যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন দেশের জন্যে, শ্রীরাধার প্রেমের মতন যিনি উন্মাদ হয়েছিলেন দেশপ্রেমে, দধীচির অস্থিদানের মতন যিনি নিজের দেহকে দান করে দিলেন দেশের কাজে, যাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি স্বপ্ন ও কল্পনাকে বাস্তবতা ও প্রগতির দিক থেকে অতিক্রম করতে পারল না ত্রিশ বৎসর পরেও আজো কোন মনীষী কোন বিপ্লবী চিন্তাবীর, তাঁকেই সেদিন দেশের লোকে, এমনকি তাঁর নিজের শিষ্যেরা পর্য্যন্ত misunderstand করল—তিনি মডারেট হয়ে গেছেন, Spent up হয়ে গেছেন বলে। রাজনৈতিক বিরোধীগণ বলে বেড়াতে লাগল তিনি গভর্ণর হবার লোভে পাগল। হায়রে; চিত্তরঞ্জন দাশের দেশের কাজে ফাঁকী! লোভের জন্যে দেশের কল্যাণ বিসর্জ্জন দেওয়া! পৃথিবীতে সবই সম্ভব হয়, নৈলে সেদিন বাঙ্গলাদেশে এ ধারণাই বা সম্ভব হয়েছিল কি করে?

গণিত শাস্ত্রে বলে Action and reaction are equal and opposite. এত বড় আঘাত আর অবিচারের প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হল ঠিক এত বড়ই। সহ্যের শেষও ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে গেল। সর্ব্বংসহা জানকীর শেষ আর্ত্তনাদের মতন দেশবন্ধুর অন্তরও সেদিন কেঁদে উঠল 'আর যে সইতে পারি না মা, এবার তুমি আমায় নাও।'

শরৎচন্দ্র বসে বসে তাঁর হাতের দশ আঙ্গুল দেশবন্ধুর দশ আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত বিশ্বাস ও সমবেদনা

সঞ্চারিত করে দিতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে বললেন "আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে আসুন স্বাস্থ্যলাভ করে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি সর্ব্বত্যাগী, আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই দেশের নেতা। দেশ আপনারই, Tom, Dick, Harryর নয়।"

কিন্তু শরৎচন্দ্রের আশা আর তারই সঙ্গে সমস্ত দেশের একমাত্র ভরসা নিঃশেষ হয়ে গেল। দেশবন্ধু স্বাস্থ্য লাভের জন্যে দার্জ্জিলিং রওনা হলেন। দার্জ্জিলিং মেল ট্রেনে রুগ্ন দেহ নিয়ে তিনি শুয়ে আছেন, অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য তাঁকে See off করবার জন্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সমবেত হয়েছেন। কত কথা কত গল্প সকলে তাঁর সঙ্গে করতে লাগলেন। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার বাঁশী যখন বেজে উঠল আর সকলে 'দেশবন্ধু কী জয়' রবে গগন বিদীর্ণ করে তুলল সহসা তাঁর দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ; অভিমান শতধারে ফেটে পড়ল, আর তাকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। ক্ষীণ কণ্ঠে গদগদ ভাষে বলে উঠলেন "তোমরা আমার Suggestionটা seriously চিন্তা পর্য্যন্ত করলে না।'

ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, দেশবন্ধু কী জয় রবে সমস্ত ষ্টেশন কাঁপতে লাগল আর তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে শিষ্য সহকর্ম্মী ও ভক্তদের কাছ থেকে, তাঁর জীবনের কর্ম্মভূমি কলকাতার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এর পরে কটা দিনই বা আর কেটেছিল ! ১৬ই জুন সন্ধ্যার পরে কলকাতার বুকে, বাঙ্গলার বুকে, নিখিল ভারতবর্ষের বুকে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত নিদারুণ বজ্রাঘাত এসে পৌঁছল—'দেশবন্ধু নেই।'

দেশবন্ধু নেই ?

সকলে সকলের মুখের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল 'হাঁ গা দেশবন্ধু নেই ?"

সেদিনের বর্ষণমুখর শশীহীন তারাহীন সজল নিবিড় কৃষ্ণ আকাশের দিকে চেয়ে সকলে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল 'দেশবন্ধু নেই ?'

আকাশ থেকে সে ধ্বনির জলে ভেজা প্রতিধ্বনি নেবে এল 'দেশবন্ধু নেই, দেশবন্ধু নেই।'

বিহ্বল মানুষ শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করে খুঁজতে লাগল আর কম্পিত ওষ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগল 'দেশবন্ধু নেই ?'

তারপরই বিহ্বলতা কেটে গিয়ে আচম্বিতে সমস্ত দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা চীৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ওগো আমাদের দেশবন্ধু নেই।'

কান্নার রোল উঠল ঘরে ঘরে, কান্নার রোল উঠল রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে, 'দেশবন্ধু নেই, আমাদের দেশবন্ধু আর নেই'।

শিষ্যেরা কেঁদে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, সহকর্ম্মীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে রৈল নির্ব্বাক হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক বিরোধীরা বজ্রাহত হয়ে শূন্য মনে আড়ষ্ট হয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল।

দেশবন্ধুর সবচেয়ে সেরা বিরোধী বাঙ্গলার নো চেঞ্জার নেতা শ্যামসুন্দর বাবু কাঁদতে কাঁদতে হাউ হাউ করে চীৎকার করে উঠলেন। কম্পিত হস্তে লেখনী নিয়ে তাঁর Servant পত্রিকার জন্য Obituary article লিখতে বসলেন। চোখের ধারায় বুক

ভেসে যেতে লাগল তাঁর। কাঁদতে কাঁদতে তিনি লিখলেন, 'Bengal if you have tears shed them now.'

সমস্ত দেশ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চতুর্দ্দিক হতে অহরহ কেবল শোকের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস অবিশ্রান্ত ভেসে আসতে লাগল।

দিন কয়েক পরে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় গেলুম। দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি বারান্দায় ইজি চেয়ারে তিনি শুয়ে আছেন, পদতলে প্রবোধ বাবু বসে আছেন।

আমি গিয়ে প্রবোধ বাবুর কাছে নিঃশব্দে বসলুম। চোখের জল হুহু করে বেরিয়ে এল. প্রবোধ বাবু অমনি আমার মাথাটিকে তাঁর বুকের উপরে টেনে নিলেন। তাঁর চোখের জল টপ টপ করে আমার মাথার উপরে পড়তে লাগল। আমার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে তিনি বলে উঠলেন 'আর কি, সব শেষ।'

শরৎচন্দ্র শুয়ে শুয়ে শোকের আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন। অকস্মাৎ কেঁদে উঠলেন 'হ্যাঁ সব শেষ।' খানিক বাদে আবার কেঁদে উঠলেন 'আমরাই শেষ করলুম তাঁকে। এত মার কি সহ্য হয়?'

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা হুহু করে কেঁদে উঠে বললেন, 'বিদায় দিয়েছ যারে নয়ন জলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?'

হঠাৎ অধীর উত্তেজনায় উঠে বসলেন, চীৎকার করে বললেন 'বেশ করেছেন। কাঁদতে কাঁদতে সেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন ত তাঁর সঙ্গে আমরা কাঁদিনি, হাত ধরে বলিনি ত তাঁকে, ওগো আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি,

আমরা তোমাকে চাই, আমরা শুধু তোমারি। তাইত তিনি শোধ নিয়েছেন। তাঁকে আমরা কাঁদিয়েছি—তিনি আমাদের কাঁদালেন। সুদে আসলে শোধ নিয়েছেন। বেশ করেছেন। We didn't deserve him. প্রবোধ We didn't deserve him.'

কান্নার ভারে আবার ইজি চেয়ারে লুটিয়ে পড়লেন।

বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় দেশবন্ধুর গৃহে। চিত্তরঞ্জন দাশের মতন এত বড় বন্ধু ও সহায়ক বাঙ্গলার বিপ্লবীদের আর কেহ ছিল না। তাঁর গৃহে সকল দলের বিপ্লবীদেরই যাতায়াত ছিল, তিনি সকলেরই বন্ধু ছিলেন। এ সময়ে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক আদর্শ সকলের এক ছিল না। অনেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে ঐ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। যুগান্তরের অনেক বিশিষ্ট কর্ম্মী এই দলে ছিলেন, অনুশীলন সমিতিরও বহু কর্ম্মী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে গ্রহণ করে আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আবার অনুশীলন সমিতির ও যুগান্তরের বহু কর্ম্মী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এদের অনেকে অহিংস উপায়ে স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা করা যেতে পারে এই তত্ত্বে কিছুমাত্র বিশ্বাস করতেন না আবার অনেকে অসহযোগের দ্বারা স্বাধীনতা আসবে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা প্রচণ্ড শক্তিতে সম্মুখে এবং পশ্চাতে টেনেছেন। এক দল এই আন্দোলনে বিপুল শক্তি সঞ্চার করেছেন আর এক দল এই আন্দোলনকে ভীষণভাবে প্রতিহত করেছেন।

যে সকল বিপ্লবী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে গ্রহণ করে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তাঁরাও আবার কাউন্সিল প্রবেশ করার প্রশ্নে ১৯২৩ সালের শেষে নো চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার এই দুই শ্রেণীতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু যে দলের বা যে মতেরই হোন না কেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হৃদয় এবং গৃহ ছিল সকলেরই জন্য খোলা এবং এই হৃদয়ের এবং গৃহের সখ্যতা ও আতিথ্য গ্রহণ করেননি এমন বিপ্লবী বাঙ্গলায় কেহ ছিলেন না।

এঁদের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা শরৎচন্দ্রের এই গৃহেই হয়।

বিপ্লবীদের শরৎচন্দ্র বড় শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহ করতেন। মতের হাজার পার্থক্য থাকলেও তিনি এঁদের চরিত্রমুগ্ধ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, অমানুষিক এবং চরম নির্য্যাতন যাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন তবু নতি স্বীকার করেননি বা একটি স্বীকারোক্তি মুখ থেকে বার করেননি, দেশকে যাঁরা আপন অস্থি মাংস অপেক্ষাও বেশী ভালবেসেছেন তাঁদের তিনি অকপটে অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা করতেন ঃ তাঁদের মত ও পথ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সম্ভব কি অসম্ভব, বাস্তব কি অবাস্তব তার চুলচেরা বিচারের তুলাদণ্ডে যাচাই করে তাঁদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতেন না, সন্তান কাণা হোক খোঁড়া হোক ফর্সা হোক কাল হোক ভাল হোক মন্দ হোক মা যেমন তাকে ভালবাসেন, শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের তেমনি ভালবাসতেন।

এ বিষয়ে দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মনের মিল ছিল ষোল আনা।

শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের কাছে তাঁদের বিগত জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী সব নিবিষ্টচিত্তে শুনতেন। তাঁদের দেশকে স্বাধীন করবার আশা ও স্বপ্ন, তাঁদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সফলতা ও বিফলতার ঘটনাবলী ও তার কারণ-পরম্পরা, বিপ্লবীদের প্রতি দেশের লোকের ধারণা ও ব্যবহার, ইংরেজের হাজত ও কারাগারে বিপ্লবীদের প্রতি অমানুষিক নির্য্যাতনের কথা সবই শরৎচন্দ্র তাঁদের নিজমুখ থেকে শুনতেন। যাঁরা ফাঁসী গিয়েছিলেন তাঁদের অমর আত্মদানের কথা শরৎচন্দ্র নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন, চোখ তাঁর সজল হয়ে উঠত। এ যুগে নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা বিপ্লবীদের নিতান্ত ভ্রান্ত বলে মনে করতেন এবং তাঁদের পন্থা ও কার্য্যকলাপকে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন এবং প্রচার করতেন। শরৎচন্দ্র এতে দুঃখিত হতেন। তিনি বলতেন, 'আমরা ননভায়োলেন্স গ্রহণ করেছি, কিন্তু যারা তা করেনি, করেনি বলেই যে তারা ভ্রান্ত একথা কি করে বলা যায়? ভারত উদ্ধার আমাদের পক্ষেই হবে, অন্য কোন পথে হবে না এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? হাসতে হাসতে যারা ফাঁসীতে ঝুলেছে তারা দেশের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দিচ্ছে এ কথার মধ্যে গোঁড়ামী ছাড়া আর কি থাকতে পারে? মহাত্মাজীর কথা আলাদা, নন-ভায়োলেন্স হচ্ছে তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত বিশ্বাস, এ তাঁর আদর্শ, এর চেয়েও ধ্রুব কোন নীতি তাঁর জীবনে আর নেই, দেশের স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসাই তাঁর কাছে বড়। তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করি তাঁর সততা ও আন্তরিকতার জন্যে, তেমনি যাদের জীবনে সবচেয়ে ধ্রুব সত্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা, সমান আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে যারা

ভায়োলেন্সের পথ গ্রহণ করেছে, ফাঁসীতে প্রাণ দিয়ে যারা স্বাধীনতার রাস্তা তৈরী করেছে, তাঁদেরও সমান শ্রদ্ধা করি, তাঁরা আমার নমস্য।'

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে তিনি কংগ্রেসের অহিংসনীতি গ্রহণ করেছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না কিন্তু বিপ্লবী কর্ম্মীদের তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যখনি প্রয়োজন হয়েছে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করেছেন। এ সময়ে হাওড়া জেলাতে শিবপুর, সালখিয়া ও ডোমজুড় প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কর্ম্মীদের কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানের বিপ্লবী কর্ম্মীদের রোগের চিকিৎসার জন্যে, আত্মগোপন করে থাকবার জন্যে এবং অন্যান্য বহুবিধ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে সর্ব্বদাই অর্থ সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রিয়তম সহচর প্রবোধ বসুর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁদের জন্যে প্রবোধ বাবু যখনি প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের কাছে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। শিবপুরের এবং ডোমজুড়ের বিপ্লবী কর্ম্মীরাও যখনি দুরবস্থায় পড়ে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র অর্থ সাহায্য করেছেন, কখনো না বলেন নি। একবার মেদিনীপুর জেলার এক বৈপ্লবিক কেন্দ্রের কয়েকজন কর্ম্মী একটি রাজনৈতিক মোকর্দ্দমায় গ্রেপ্তার হয়ে হুগলী জেলে ছিলেন, চুঁচুড়া আদালতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁদের বিচার হয়েছিল। এঁদের দলের শ্রীস্বদেশ রঞ্জন দাশ ছিল আমার বন্ধু। আদালতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, স্বদেশ রঞ্জন বললে 'ভাই জেলখানাতে সময় কাটানর জন্যে কিছু বই দিয়ে যেও, আর শরৎ দাকে আমাদের প্রণাম দিও।' আমি শরৎচন্দ্রকে গিয়ে

বল্লুম, তিনি আমার হাত দিয়ে তাদের জন্যে অনেক টাকার বই কিনে পাঠিয়ে দিলেন। স্বদেশ একখানা ভাল গীতা চেয়েছিল, শরৎচন্দ্র নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে তিনখানা বিভিন্ন প্রকারের ভাল গীতা এনে পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ৺বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের বহু বিপ্লবী কর্ম্মী ছিলেন বিপিনদার শিষ্য। এঁদের যে কেহ যখনি কষ্টে পড়ে শরৎচন্দ্রের সাহায্য চেয়েছেন তিনি তখনি তাঁর সস্নেহ সাহায্য পেয়েছেন।

বিপিন দা সম্পর্কে ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতুল কিন্তু বয়সে ছিলেন ছোট। বিপিনদাকে শরৎচন্দ্র বিপিন বলতেন। কি ভালই বাসতেন তিনি বিপিনদাকে। কতবার দুঃখ করতেন 'কি অদ্ভুত এই বিপ্লবীরা তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের বিপিন। কি কষ্টই দেশের জন্যে সারা জীবন করছে, অর্দ্ধেক জীবন ত জেলেই কাটাল। কত বলি বিপিন আমার বাড়ীতে এসে মাঝে মাঝে দু'চার দিন থাক, একটু ভাল খাও, একটু ভাল বিছানায় শোও, একটু আদর যত্ন গ্রহণ কর, তা ওর সময়ই হয় না। সময় হবে কোত্থেকে, দেশের চিন্তা ছাড়া ওর কি আর কোন চিন্তা আছে? কিছুই নেই।'

বাঙ্গলার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ৺যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) আমাদের আত্মীয় ছিলেন। আমার মাতুলালয়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন আমার মাসতুত দাদা। মামাত পিসতুত ও মাসতুত সব ভাইয়েদের মধ্যে তিনি বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন বলে সব ভাইয়েরাই তাঁকে বড়দা বলতেন। বড়দা যখন বালেশ্বরের যুদ্ধে মারা যান তখন অবশ্য আমি খুব শিশু। কিন্তু

তথাপি বড়দার কথা আমার খুব মনে ছিল এবং তাঁর জীবনের বহু কাহিনী আমার জানা ছিল। আমাদের মাতুলালয় কয়া গ্রামের সকল লোকেই বড়দার জীবন কাহিনীগুলি খুব গল্প ও আলোচনা করত। কয়ার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে বড়দার জীবন স্মৃতিকে নিজেদের পরম গর্ব্বের বস্তু বলে মনে করত। শরৎচন্দ্র আমার মুখ থেকে বড়দার জীবন কাহিনীর ছোট খাটো খুঁটিনাটিগুলি পর্য্যন্ত দিনের পর দিন বসে শুনেছেন।

বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলেই শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পথের দাবী এই সময়ে রচনা করেন। অনেকে মনে করেন যে কোন বিশেষ বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়াবলম্বনে শরৎচন্দ্র পথের দাবীর নায়ক সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রণ করেছেন। এ ধারণা সত্য নয়। সমস্ত বিপ্লবীদের জীবনের কাহিনী শুনে এবং অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করে তিনি আপন কল্পনার দ্বারা সব্যসাচীর মধ্যে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের একটি Type সৃষ্টি করেছিলেন। তবে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়া বিশেষ করে সব্যসাচী চরিত্রে পড়েছে। দুর্জ্জয় সাহস অসাধারণ শারীরিক শক্তি অসীম স্নেহ-প্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা—এইগুলি নিয়েছেন ৺যতীন মুখার্জ্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে বেড়ান ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠনের দিকটা নিয়েছেন ৺রাসবিহারী বসু ও ৺নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের (এম এন রায়) জীবন থেকে, নানা দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট

ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে। দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলবার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্ত্তী এবং আরো কয়েকজনের ছাপ আছে। তিল তিল করে সৌন্দর্য্য আহরণ করে যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হয় তেমনি সব্যসাচীর চরিত্রের মধ্যে বহু বিপ্লবীর জীবনের ছাপ আছে, নিছক কল্পনা দিয়ে তিনি সব্যসাচীর চরিত্রের একটি আঁচড়ও টানেননি। যাঁরা মনে করেন সব্যসাচীর চরিত্র শরৎচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি, ওটা একটা অবাস্তব বস্তু তাঁরা বিষম ভ্রান্ত। পথের দাবীর প্রত্যেকটি চরিত্রই বাস্তব এবং ঐতিহাসিক। বাঙ্গলার এবং ভারতবর্ষের টেররিষ্ট আন্দোলনের মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র এঁদের কুড়িয়ে নিয়েছেন। সব চরিত্র গুলোই রিয়েলিষ্টিক, কোনটাই কাল্পনিক নয়। সত্য সত্যই যা ছিলনা তা শরৎচন্দ্র আঁকেননি। Tale of two cities লেখবার সময়ে ডিকেন্স যেমন করেছিলেন তেমনি শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের টেররিষ্ট আন্দোলনের সম্পর্কে অনেক শুনেছেন অনেক জেনেছেন, বিস্তর অনুসন্ধান করেছেন এবং তার পরে প্রকৃত তথ্যের ও জীবনের ছায়াবলম্বনে তাঁর গ্রন্থের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন। পথের দাবীর প্রত্যেকটি চরিত্র এমন কি শশী কবি পর্য্যন্ত সত্যকার ঐতিহাসিক জীবনের ছায়াবলম্বনে অঙ্কিত।

পথের দাবী যখন প্রকাশিত হল তখন গ্রন্থখানি যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত কোন গ্রন্থ কোনদিন এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে কি না সন্দেহ। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কপি বিক্রী হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি

নাকি গ্রন্থখানি পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। বিক্রী শেষ হতে সাত দিন লেগেছিল কিনা সন্দেহ। কোন কোন দোকানদার তিন টাকা মূল্যের গ্রন্থখানি দশ টাকা মূল্যেও বিক্রী করেছেন, পাঠক পাঠিকারা অধীর আগ্রহে তাই দিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করে দিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশিত হল না। পথের দাবী যদি বাজেয়াপ্ত না হত তাহলে বছর খানেকের মধ্যেই যে এক লক্ষ কপি বিক্রী হত তাতে আর সন্দেহ নেই। সে ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র লক্ষ টাকা মুনাফা করতে পারতেন। পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়াতে বাঙ্গলা দেশে সকলেই মর্ম্মাহত হয়েছিলেন।

পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয় সেই সময়েই ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিখ্যাত আমেরিকান পাদ্রী ও লেখক Reverend J. T. Sunderland কর্ত্তৃক রচিত India in Bondage গ্রন্থখানিও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। রামানন্দ বাবু এই বাজেয়াপ্তির জন্যে কলকাতা হাইকোর্টে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকার্দ্দমা রুজু করলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্র শিবপুরের বাসা তুলে দিয়ে হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে রূপনারায়ণ নদের তটে অবস্থিত পানিত্রাস গ্রামে বাড়ী তৈরী করে সেখানে বাস করছিলেন। একদিন পানিত্রাসে গেছি, শরৎচন্দ্র বললেন, 'পথের দাবীর বাজেয়াপ্তির জন্যে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমিও হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা ক'রব।' এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে তিনি তাঁর বিশেষ অনুরক্ত বন্ধু ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী স্বনামধন্য ৺নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রকে একখানি পত্র লিখলেন এবং আমার হাত দিয়ে সেই পত্র পাঠালেন। আমি পর দিন পত্রখানি

৺নির্ম্মল বাবুকে দিয়ে এলাম। ৺নির্ম্মলচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে মোকর্দ্দমা করতে নিষেধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রও মোকর্দ্দমা করলেন না। ৺রামানন্দ বাবু যে মোকর্দ্দমা দায়ের করেছিলেন সে মোকার্দ্দমাতে তাঁর হার হয়ে গেল। হাইকোর্ট গভর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্তির পক্ষেই হয়ে রায় দিলেন। অন্যরূপ হবেই বা কেন? তবে ৺রামানন্দ বাবু মোকর্দ্দমা করে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিদেশী রাজার আদালতও যে বিচারের ক্ষেত্রে রাজার অন্যায়ের বিপক্ষতাচরণ করতে পারে না সেই তত্ত্বই তিনি মামলা করে উদ্‌ঘাটন করে দিলেন। শরৎচন্দ্রও মামলা করলে অনুরূপ পরিণতিই ঘটত। ৺নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র শরৎচন্দ্রের অর্থের অপব্যয় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়াতে শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়েছিলেন। পুত্র শোকের মতন শোক তাঁর মনে বেজেছিল। তিনি এর প্রতিবাদ হোক এই চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের উপরে এই পুলিসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'তোমার বই আমি পড়ে দেখে তার পর বলব।' শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পথের দাবী দিয়ে এলেন। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এক পত্র লিখে প্রতিবাদ করতে তাঁর অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। এই পত্র পড়ে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের উপর খুব অভিমান হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সে পত্র আমরাও শরৎচন্দ্রের কাছে দেখেছি। পত্র পড়ে আমরাও খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। অভিমানে শরৎচন্দ্র গুরুদেবকে বর্জ্জন করেছিলেন, বহুদিন আর রবীন্দ্রনাথের কাছে যাননি। অনেকদিন এমনি করেই কেটে গেল। কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রথম

রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি ৺প্রমথ চৌধুরীকে পদত্যাগ করিয়ে সেইস্থলে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করান এবং বিশেষ দূত প্রেরণ করে শরৎচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক আদরে তাঁর অভিমান ভাঙ্গান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে দিন কেটে যেতে লাগল। কত সপ্তাহ মাস গড়িয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী এসে বাঙ্গলার নেতৃত্বের শূন্য আসনে যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তকে বসিয়ে দিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ, কলকাতা করপোরেশনের মেয়র পদ ও কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টির নেতৃপদ এই Triple crown বা ত্রি-মুকুট তিনি যতীন্দ্র মোহনের মাথায় পরিয়ে দিলেন। যতীন্দ্র মোহন অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্বভার পালন করতে লাগলেন। চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙ্গলায় যে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় অন্ধকার নেমে এসেছিল যতীন্দ্র মোহন তাঁর নেতৃত্বের আলোক বর্ত্তিকা দিয়ে সে অন্ধকার অনেকটা বিদূরিত করলেন। কংগ্রেসের কাজ বাঙ্গলাদেশে ভালই চলতে লাগল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বাঙ্গলাদেশ সহসা যেন অনাথ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং Young India পত্রিকায় লিখেছিলেন The giant amongst men has fallen, Bengal is widowed. এখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে বাঙ্গলাদেশ সেই অনাথ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠল, নিখিল ভারতের মধ্যে বাঙ্গলার অবস্থা যে বিশেষ শোচণীয় হয়ে পড়ল তা নয়। তবে চিত্তরঞ্জন তীব্র জ্যোতিতে

সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত করছিলেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মণীষার দ্বারা নিখিল ভারতের নেতৃত্ব করছিলেন, সে গৌরব বাঙ্গলার চলে গেল। চিত্তরঞ্জনের আমলে বাঙ্গলা ছিল সকলের পুরোভাগে, এখন বাঙ্গলা রৈল সকলের সঙ্গে। নিখিল ভারতের নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল পণ্ডিত মতিলালের হাতে।

দেশবন্ধু লোকান্তরিত, সুভাষচন্দ্র এ সময়ে সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে অন্তরীত, বাঙ্গলাদেশের বহু বিপ্লবযুগের নেতা ও কর্ম্মী কারারুদ্ধ ও অন্তরীণে। এই সব কারণে শরৎচন্দ্র এ সময়ে বড় একা একা বোধ করতে লাগলেন। মন তাঁর বড় বিষণ্ণ, নিরানন্দ, একটা কেমন অবসাদ যেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে। কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে, কোথায় যেন একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। মনটা বড় উদাস। কংগ্রেসের কাজে তাঁর যেটুকু করণীয় ঠিক করে যান, রুটিনের কোন ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু মনের প্রফুল্লতা যেন অনেক কমে গেছে।

মনের এই অবসাদ ঝেড়ে ফেলবার জন্যে শরৎচন্দ্র খানিকটা অন্য কাজে মন দিলেন। পথের দাবী রচনা শেষ করতে লাগলেন, রূপনারায়ণ নদের তীরে পাণিত্রাস সামতাবেড় পল্লীতে বাড়ী তৈরী আরম্ভ করলেন এবং দেনা-পাওনা উপন্যাস খানিকে নাট্যরূপ দিয়ে 'ষোড়শী' রচনা করলেন।

এমনি ভাবে বছর দুই কেটে গেল। ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করলেন। বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারাও মান্দালয় জেলে ছিলেন, তাঁরাও মুক্তিলাভ করলেন। ১৯২৪ সালে রেগুলেশন

আইন (Regulation III of 1818,) ও বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনে ধৃত রাজবন্দীগণও মুক্তিলাভ করলেন। বাঙ্গলাদেশের অনেক ধৃত ও অবরুদ্ধ কর্ম্মী আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন। এই মুক্ত রাজবন্দীদের সংখ্যা সর্ব্ব সাকুল্যে বোধ হয় দুই শতাধিক ছিল।

কারাপ্রাচীরের অবরোধ থেকে মুক্তিলাভ করলেন বটে কিন্তু মুক্তি এদের কোথায়? পরাধীন দেশে মুক্ত রাজবন্দীর স্থান কোথায়? ফুটপাতে আর গাছতলায়। যে অল্প কয়েকজনের নিজ গৃহ ছিল তাঁরা আপন গৃহে ঠাঁই পেলেন, যে কয়েকজনের পিতামাতা জীবিত ছিলেন তাঁরা পিতামাতার কোলে ঠাঁই পেলেন, কিন্তু বাকী অধিকাংশ? দেশের এবং সমাজের সকল দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ। ভাই বোন আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতি স্বজন বন্ধু বান্ধব, মেস বোর্ডিং হোটেল সকলের দরজা এদের কাছে বন্ধ। এদের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে সে বাড়িতে দিবারাত্রি সি আই ডি পাহারা বসে, রাস্তায় এদের সঙ্গে আলাপ করলে সি আই ডিতে নাম ধাম টুকে নেয়। এদের ছায়া পর্য্যন্ত বিপজ্জনক। কোন আপিসে দোকানে কারখানায় এরা চাকরী পান না। কোন স্থানে এদের কেহ চাকরী পেলে সেখানে টিকটিকী পুলিসের আনাগোনা আরম্ভ হয়ে যায়। কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। মুক্ত রাজবন্দীদের অবস্থা হল তেমনি। গভর্ণমেণ্ট এদের রাজবন্দী করে কয়েক বৎসর জেলখানাতে বিনা বিচারে আটক রেখে পরিশেষে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ছেড়ে দিয়েও এদের জীবন দুর্ব্বিষহ করে দিলেন। এদের নামের উপরে বিপ্লবী ছাপ মেরে দিলেন, দিবারাত্র অহরহ এদের গতিবিধি গোপনে তদারক করবার জন্য পালে পালে টিকটিকী পুলিস লেলিয়ে দিলেন। ফলে এদের

জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল। কেহ এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, আশ্রয় দিতে সাহস করে না, লোকে কথা বলতে পর্য্যন্ত ভয় পায়। এদের সকলেই প্রায় কংগ্রেসের কাজ করতে করতেই গ্রেপ্তার হয়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন, এখন সেই কংগ্রেসেও এদের অবস্থা খুব ভাল নয়। কংগ্রেসের অনেক লোকই এদের এড়িয়ে চলতে লাগল। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা এদের সুনজরে দেখতেন না, স্বরাজীরাও আমল দিতে চান না। দেশের লোকে ভয় পায়, টিকটিকী পুলিস অহরহ প্রেতের মত অনুসরণ করে বেড়ায়। জীবন এদের দুর্বিবষহ হয়ে উঠল।

শরৎচন্দ্র সহসা কি যেন এক সঞ্জিবনী প্রেরণায় জেগে উঠলেন। তাঁর মনের অবসাদ ও ক্লান্তি যেন নিমেষে অপস্থত হয়ে গেল। অন্তরের মধ্যে যেন কার ভৈরব আহ্বান তিনি শুনতে পেলেন। বাঙ্গলার এই বিপ্লবী নাগ শিশুদের তিনি যেন অশেষ লাঞ্ছনা হতে বাঁচাবার জন্য মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রবোধ বাবুকে ডাকলেন, তাঁর সকল অনুচরকে ডাকলেন। সবাইকে ডেকে তিনি বললেন "ওহে, হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরীক সম্বর্দ্ধনা দেব। জাঁকাল সভা করতে হবে। এমন জমকাল করে এদের অভ্যার্থনা করতে হবে যাতে দেশের মধ্যে একটা Moral impression হয়। হাওড়ার সমস্ত youths যাতে এই সভাতে এসে যোগদান করে তার বন্দোবস্ত কর।

"দেশের জন্যে যারা নিজেদের রিক্ত করেছে, নিঃস্ব করেছে আজকে তারাই হবে দেশের লোকের ভয়ের পাত্র? দেশ ছাড়া যাদের আর কিছু নেই দেশ হবে তাদের প্রতি বিমুখ? কেন? টিকটিকীর ভয়ে?

আই বি আর স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখনো দেশের লোকের মনকে করবে শাসন? কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়ল, রাজবন্দী হ'ল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন, সম্বর্দ্ধনা জানাবে না কেন? গভর্ণমেণ্ট তাদের রিভলিউশনারী বলেছে বলে? তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই কথা গভর্ণমেণ্ট রটিয়েছে বলে? গভর্ণমেণ্ট কি হবে আজ আমাদের Conscience keeper? আমাদের নীতিবুদ্ধি কি আমরা Identify করব গভর্ণমেণ্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means. We must receive them and congratulate them openly and whole-heartedly. কলকাতাতেই এটা প্রথমে হওয়া উচিত ছিল, বি, পি, সি, সিরই এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন হলনা, তখন আমরাই প্রথমে করব। তোমরা এর ব্যবস্থা কর।"

শরৎচন্দ্র আপন অনুচরদের সহযোগীতায় উঠে পড়ে লাগলেন এই নাগরীক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজনের জন্য। কলকাতাতে এবং চারিদিকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ যে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শরৎ চাটুজ্যের সভাপতিত্বে হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরীক সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন হচ্ছে।

হাওড়াতে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। শরৎচন্দ্র চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ সভাসমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হতেন। কিন্তু আজ তিনি নিজের স্বভাবের ব্যতিক্রম। আজ তিনি নিঃসঙ্কোচ, কুণ্ঠাহীন, দ্বিধা লজ্জামুক্ত। স্বল্পবাক শরৎচন্দ্র আজ প্রগলভ। নিরীহ অলস শরৎচন্দ্র আজ বেগবান এবং কর্ম্মঠ। আজ তিনি ভগীরথ।• শঙ্খধ্বনি

করতে করতে নূতন ভাবগঙ্গাকে আবাহন করে নিয়ে আসছেন বাঙ্গলাদেশে। যথাদিনে হাওড়া টাউন হলে রাজবন্দীদের সম্বর্দ্ধনা সভা হল। শরৎচন্দ্র নিজে সম্বর্দ্ধনা পত্র পাঠ করলেন। হাওড়া বাসীরা কাতারে কাতারে এসে মাল্যচন্দন দিয়ে রাজবন্দীদের বরণ করলেন। হাওড়া টাউন হলে সেদিন লোকারণ্যে তিলধারণের স্থান ছিলনা। যাঁরা ছিলেন অবজ্ঞাত তাঁরা হলেন পূজিত, যাঁরা ছিলেন ভয়ের পাত্র, তাঁদেরি সম্বর্দ্ধিত করে লোকে পূর্ণ করল আপন অন্তরের বরাভয়ের পাত্র।

শরৎচন্দ্র যা চেয়েছিলেন তাই হল। হাওড়ার সম্বর্দ্ধনা সভার পরেই দেশের চতুর্দ্দিকে প্রকাশ্যভাবে রাজবন্দীদের সম্বর্দ্ধনা সভা হতে লাগল। যেন একটা চকিত অশনি বর্ষণে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে গেল, একটা দমকা বাতাসে সমস্ত আবহাওয়া বদলে গেল। এর ফলে মুক্ত রাজবন্দীদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা বহুল পরিমানে প্রশমিত হল এবং কংগ্রেসের মধ্যেও মুক্ত রাজবন্দীরা একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভের সুযোগ লাভ করলেন। এতে যে মুক্ত রাজবন্দীদেরই শুধু কল্যাণ হয়েছিল তাই নয় দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনেও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল।

হাওড়ার সম্বর্দ্ধনা সভাটিই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি ও অবদান। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও এটি একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। এর পূর্ব্বে দেশে আর কখনো বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা হয়নি। এই দিক দিয়ে হাওড়ার সভা একটি অভিনব সভা।

একটি সাধারণ জনসভা মাত্র, কিন্তু গুরুত্ব তার কম নয়,

—অসাধারণ। প্রতিক্রিয়া তার সুদূর প্রসারী। অনেক কিছুর বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ। গভর্ণমেণ্টের ভীতি প্রদর্শন নীতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, দেশের লোকের ভীতি বিহ্বলতার প্রতি চ্যালেঞ্জ, নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীদের ভায়োলেন্স শুচিবায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ, ধনিক-প্রধান স্বরাজীদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ। ব্যারিষ্টার এটর্ণী না হলে, মোটরে চড়ে সভায় বক্তৃতা করতে না এলে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে লীডার হয় না এই মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ।"

গদগদভাবে শরৎচন্দ্র সেদিন বললেন "দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে, এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্ব্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চির চঞ্চল চিরজীবি চির তরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি তোমাদের এতবড় আপনজন এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।"

বাঙ্গলার রাজনৈতিক মঞ্চে ডেটিনিউদের কোনঠাসা করে রাখবার ফন্দী এবং চেষ্টা অনেকেরই ছিল, শরৎচন্দ্র একটি ফুৎকারে সেইসকল অপচেষ্টাকে খান খান করে দিলেন।

হাওড়ার সম্বর্দ্ধনা সভার পরে বাঙ্গলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাকা সহসা যেন ঘুরে গেল। উপল চাপা ভাগীরথীর উৎস মুখ খুলে গেল। বাঙ্গলার যুবচিত্ত যেন সোনার কাঠির যাদু স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে

জেগে উঠল। তাদের মন থেকে ভেসে গেল বিগ ফাইভ, ভেসে গেল চরখা তকলীনিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। জেলায় জেলায় দিকে দিকে আরম্ভ হল রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা। জেলা সম্মেলন, যুব সম্মেলন সংগঠনের হিড়িক পড়ে গেল কোন না কোন রাজবন্দীকে সভাপতি করে। বিপিন গাঙ্গুলী, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস এবং আরো কত সুপ্রসিদ্ধ রাজবন্দীকে সভাপতি করে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হতে লাগল সম্মেলনের পর সম্মেলন।

আর এই সকল সম্মেলনে মুক্ত রাজবন্দীরা প্রচার করতে লাগলেন স্বাধীনতার অগ্নিময়ী বাণী, প্রচার করতে লাগলেন দুঃসাহসের বাণী, দেশের মুক্তির জন্যে জীবন বিসর্জ্জনের, সর্ব্বস্ব অর্পণের আদর্শবাদ। একদিকে পথের দাবীর সব্যসাচীর অমোঘ মন্ত্র 'ভারতী, আমি চাইনা দেশের সমৃদ্ধি, দেশের কল্যাণ, আমি চাই দেশের স্বাধীনতা' অপর দিকে রাজবন্দীদের স্বাধীনতার বজ্র নির্ঘোষ, বাঙ্গলার যুব চিত্তে মুহুর্মুহু তড়িৎ শিখা জ্বালিয়ে দিতে লাগল। বিপ্লবী বাঙ্গলা আবার তার চিরন্তনী প্রাণশক্তি নিয়ে জেগে উঠল। রুদ্র বাঙ্গলা আবার তার শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে পিনাক হস্তে প্রলয় নাচনে মেতে গেল। বিপ্লবের নৃত্য হিন্দোলে বাঙ্গলা আবার দোদুল দোলায় দুলতে লাগল। বাঙ্গলার বিপ্লবী নাগশিশুদের অগ্নিনালিকা চারিদিকে গর্জ্জন করে উঠল। লালবাজারে টেগার্টের উপরে গুলী চালাল অনুজা সেন, রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর মধ্যে প্রবেশ করে গুলি চালাল বাদল দীনেশ বিনয়, মেদিনীপুরে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরে চলল বিপ্লবীর গুলি, ঢাকায় ইংরেজ আই জির উপরে চলল গুলি, চট্টগ্রামে সূর্য্য সেন,

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতির অগ্নিনালিকা অসম্ভবকে করল সম্ভব, ইংরেজের অস্ত্রাগার চলে গেল বিপ্লবীর দখলে। বাঙ্গালী বিপ্লবী মেয়েরাও আরম্ভ করে দিল রিভলবার হাতে স্বাধীনতার নান্দীপাঠ। চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে রিভলবার নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আপন গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসান সভাতে লাট সাহেবের উপরে গুলি চালাল বীণা দাস।

চারিদিকে অগ্নিলীলা আরম্ভ হয়ে গেল। ত্রাসে ইংরেজের প্রাণ কেঁপে উঠল। স্বাধীনতার পশ্চাতে এইসব আত্মদান, প্রাণদান দুঃসাহস ও অগ্নিলীলার অবদান কতখানি আছে দেশের মানুষই আজ তার বিচার করবে।

অগ্রাণের পাকা ধানের ভরা মাঠের সোনার হাসির অনেক পিছনে লুকিয়ে থাকে বৈশাখের হলকর্ষণ। বসন্তের পত্রপুষ্পের পুঞ্জীভূত মঞ্জু শোভার অনেক পিছনে সঙ্গোপনে থাকে শিকড়ের জঠরে প্রাবীটের ধারার সঞ্চয়।

পত্র পুষ্পের সমারোহ থেকে আসুন শাখায়, শাখা থেকে নেবে আসুন কাণ্ডে, আরো নিম্নে চলে যান মৃত্তিকা গহ্বরে, দেখতে পাবেন শিকড়ের একটা ফ্যাকড়া আছে সেখানে—হাওড়া টাউন হলের রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনা সভা।

মুক্ত রাজবন্দীদের সাহচর্য্য লাভ করে এই সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের প্রফুল্লতা আবার ফিরে এল। বহু দিনের বিরহের পরে আপন জনদের সঙ্গে মিলন হল। সুভাষচন্দ্র ফিরে এসেছেন, বিপিন গাঙ্গুলী ফিরে এসেছেন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তি লাভ করেছেন, সত্যেন মিত্তির এসেছেন, সন্তোষ মিত্তির এসেছেন, আরো কত স্নেহভাজন সহকর্ম্মী বন্দীশালা ও অন্তরীণ মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। এঁদের সঙ্গলাভ করে শরৎচন্দ্রের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুব সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলন ও স্বরাজ আন্দোলনকে এক সঙ্গে সংযুক্ত করার কর্ম্মপদ্ধতিকে সমালোচনা করলেন এবং চরখা খদ্দর দ্বারা স্বরাজ লাভের আশাকে বিদ্রূপ করলেন। নো চেঞ্জাররা শরৎচন্দ্রের উপর খুব চটে গেলেন কিন্তু তিনি তাঁদের অসন্তোষকে গ্রাহ্যই করলেন না। ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরে তিনি দিনাজপুর সম্মেলন থেকে চলে এলেন।

বাঙ্গলার তরুণ মনে এ সময়ে শরৎচন্দ্র অসীম প্রভাব বিস্তার করে বসেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার যেন কোন পরিমাপ ছিল না। বাঙ্গলার যুব জনচিত্তে তিনি তখন Heroর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর

পানিত্রাস সামতাবেড়ের বাড়ী তখন বাঙ্গলার তরুণদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দলে দলে বাঙ্গালী শিক্ষিত তরুণ দেউলটি ষ্টেসনে নেবে তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে সামতাবেড়ে তাঁর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হয় তাঁকে দর্শন করতে।

পথের দাবীর জনপ্রিয়তা ত ছিলই, তা ছাড়া বাঙ্গলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী তাঁর ষোড়শী নাটকের জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্র অভিনয় করে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে দিলেন। এ সময়ে বাঙ্গলার অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্ম্মীরা জমিদারী প্রথা বিলোপের কথা চিন্তা করতে ও প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কৃষকের উপর জমিদারী প্রথাকে তাঁরা শোসনের জগদ্দল পাথর বলেই অভিমত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। এই অভিমতে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা ষোড়শী অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শিশির বাবুর জীবানন্দ, যোগেশ বাবুর রায় মহাশয় ও মনোরঞ্জন বাবুর সাগর সর্দ্দারের অভিনয় দেখে তাঁরা জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন ও শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রণত হতে লাগলেন।

এই সময়ে বাঙ্গলাদেশে সোস্যালিজমের আমদানী হতে আরম্ভ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বিপ্লব যুগের নেতা ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, জার্ম্মাণী ফেরৎ ডাঃ কানাই লাল গাঙ্গুলী, মুক্ত রাজবন্দী অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ কুমার মিত্র, দেশবন্ধুর শিষ্য হেমন্ত কুমার সরকার প্রভৃতি তখন সোস্যালিজম প্রচার করছেন। অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী ও মুক্ত রাজবন্দী তখন সোস্যালিষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা অর্থনৈতিক শোষণের অবসানের আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। "ইকনমিক স্বরাজ" কথাটার তখন প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

সারাজীবন শরৎচন্দ্র শোষণের বিরুদ্ধে পীড়নের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ছলনা বঞ্চনা শঠতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী চালনা করে এসেছেন। সমাজে যারা বঞ্চিত যারা পীড়িত যারা অত্যাচারিত ও শোষিত শরৎ সাহিত্য তাদেরি বেদনার কথায় ভরপুর। আজ তাই প্রগতিশীল এবং পরিবর্ত্তনকামী কর্ম্মীর দল স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের কাছে আসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে তাঁরা প্রেরণা পেলেন, নূতন আলো পেলেন। জমিদারী বিলোপ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে নূতন মনোভাব ও আদর্শ কর্ম্মীদের মনে এ সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল শরৎচন্দ্রের কাছে সেই মনোভাব ও আদর্শ উৎসাহ পেতে লাগল। শত শত কর্ম্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নূতন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র সভাতে বক্তৃতা করতেন না। সভাতে বক্তৃতা করবার তাঁর দরকারও হত না। তাঁর কাছে প্রতিদিন কর্ম্মীরা আসতেন, ছাত্রেরা এবং তরুণেরা আসতেন। তিনি নিজের ইজি চেয়ারে বসে বসে সমস্ত বাঙ্গলাদেশকে এসময়ে প্রবুদ্ধ করেছেন। সুভাষচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সুপ্রসিদ্ধ রাজবন্দীগণ এবং নগণ্য কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে আসতেন তাঁর কথা শুনতে তাঁর মতামত শুনতে।

এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ডাঃ কানাই লাল গাঙ্গুলী সন্তোষ কুমার মিত্র ডাঃ সুবোধ বসু এই বৈঠকগুলিতে যোগদান করেছিলেন। ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আর ছিলুম আমরা কয়েকজন তাঁর নিত্যসঙ্গী—আমি, প্রবোধ বসু এবং

শিবপুরের অগম দত্ত ও জীবন মাইতী। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাঙ্গলাদেশে একটি সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং আমাদের অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন। বাঙ্গলাদেশে প্রথম সোস্যালিষ্ট নিউক্লিয়াস এইরূপে তিনিই সৃষ্টি করে দেন। কাজও অবিলম্বেই আরম্ভ হয়ে গেল। এর পরে অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, কলকাতার কংগ্রেস কর্ম্মী যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, হুগলীর রাজবন্দী কালী কুমার সেন, কলকাতার রাজবন্দী অনুকুল মুখোপাধ্যায়, নদীয়ার রাজবন্দী পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপের শচী গাঙ্গুলী, শান্তিপুরের নীরোদ খাঁ, বরিশালের আশু দাস, শালখিয়ার রাজবন্দী ও সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী, আবদুল মোমিন প্রভৃতি এই নিউক্লিয়াসে এসে যোগদান করেন এবং সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় মধ্য কলকাতায় অক্রূর দত্ত লেনে। সন্তোষ মিত্রের খুল্লতাত ভ্রাতা রাজবন্দী পান্নালাল মিত্র ও হালিসহরের রাজবন্দী নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিবারাত্রি এই কর্ম্মকেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করতেন।

এই সময়ে হাওড়ার গার্ডেন রীচের এ জে মেইন কোম্পানী নামক একটি বিলাতী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার বাঙ্গালী শ্রমিকরা অত্যাচার ও শোসনে জর্জ্জরিত হয়ে অকস্মাৎ একদিন ধর্ম্মঘট করে বসল। সংবাদ শুনামাত্র শরৎচন্দ্র অগম দত্ত, জীবন মাইতী ও আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন ঐ ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করতে ও ধর্ম্মঘট পরিচালনা করতে। আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সংঘবদ্ধ করে ফেললুম এবং ধর্ম্মঘট পরিচালনার কাজে নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তির উপরে নির্ভর করতে না পেরে ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলীর সাহায্য প্রার্থনা করলুম।

কানাই দা তৎক্ষণাৎ এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। ডাঃ সুবোধ বসু ও কিশোরী ঘোষও এসে যোগদান করলেন। ইউনিয়ন গঠিত হল এবং ধর্ম্মঘট পরিচালিত হতে লাগল। অনেকদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালিয়ে যেতে হয়েছিল। পরিশেষে শ্রমিকদের জয়লাভ হল। এই ধর্ম্মঘট পরিচালনায় আমাদের শরৎচন্দ্রের কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি কিন্তু ধর্ম্মঘটীদের সাহায্য করবার ও ধর্ম্মঘট পরিচালনার প্রাথমিক প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনিই আমাদের প্রেরণাদাতা জেনেই প্রবোধ বসু এবং শিবপুরের কংগ্রেস কর্ম্মী গুরুদাস দত্ত ও ডাঃ বেণীচরণ দত্ত প্রভৃতিরা আমাদের কাজে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

এই ধর্ম্মঘটে জয়লাভ করার পরে আমি, অগম ও জীবন হাওড়া মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়ন গঠন করি। ইউনিয়নের আমি ছিলাম সেক্রেটারী এবং কলকাতার ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। ইউনিয়ন গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মেথরদের ধর্ম্মঘট আরম্ভ করি। মেথর মেথরানি ও ঝাড়ুদারদের উপরে এত পীড়ন ও অবিচার হত যে ধর্ম্মঘট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তখন কংগ্রেস পরিচালনাধীন। শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট; প্রবোধ দা হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা এবং আমাদের বিশেষ সুহৃৎ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাতুল্য ডাঃ বেণীচরণ দত্ত ও অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য এঁরাও হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। বিজয়দা আবার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান তখন স্বনাম-ধন্য শ্রীবরদা পাইন।

ধর্ম্মঘট ত আরম্ভ করে দিলুম। ধর্ম্মঘট ঘোষণার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রকে সব কথা বলে প্রণাম করে তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইলুম।

তিনি আশীর্ব্বাদ করে হেসে বললেন "এবার কি গুরুমারা বিদ্যে আরম্ভ করলে ?"

আমি একটু বিব্রত বোধ করলুম। আমার অবস্থা বড় ডেলিকেট। বললুম, "কি কোরব বলুন, ইউনিয়ন গড়ে তুলে এখন ত আর পেছিয়ে আসা যায় না।"

তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন "না পেছিয়ে আসা চলবে না, কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কি জন্যে হচ্ছে সেইটেই বড় কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। সমাজে মেথর আর বেশ্যা, এদের চাইতে worst persecuted আর কেউ নেই, সেই মেথরদের cause নিয়েছ—দ্বিধা সংকোচের কিছু নেই, এগিয়ে যাও।"

একটু নীরব থেকে আবার বললেন "তবে বড় Premature হয়ে গেল। তোমাদের group এখনো তেমন Strong হয়নি ত! অবশ্য অগম, জীবন তোমাকে ফেলে পালাবে না, প্রবোধও Antagonise করবে না, কিন্তু বেণী, বিজয়, ভোলা* এরা যে কি attitude নেবে তা ত বুঝতে পারছি না।"

শরৎচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে এলুম। ধর্ম্মঘট সুরু হয়ে গেল। ষোল আনা ধর্ম্মঘট চলতে লাগল। মিউনিসিপ্যালিটি ধর্ম্মঘট ভাঙ্গবার অনেক চেষ্টাই করল কিন্তু কিছুই করতে পারল না। পূর্ণ ধর্ম্মঘট চলতে লাগল।

* ভোলানাথ রায়, অধ্যাপক ও এ্যাডভোকেট, শিবপুরের বাসিন্দা, শরৎচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত, কংগ্রেস কর্ম্মী ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

এক সপ্তাহ ধর্ম্মঘট চলবার পরে হাওড়া সহরের অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠল। সহরের সর্ব্বত্র খাটা পায়খানা। আমরা বুঝতে পারলুম আর দিনকয়েক ধর্ম্মঘট চালাতে পারলেই আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য বেণী দা বিজয় দা ও ভোলানাথ বাবু আমাদের সঙ্গে কোন দুর্ব্ব্যবহার করেননি, আমাদের প্রতি তাঁদের নীরব সহানুভূতিই ছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ধর্ম্মঘট ভাঙ্গবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কোন কোন কমিশনার শরৎচন্দ্রকে গিয়ে বললেন "এই ছোকরাগুলো ত আপনারই শিষ্য, আপনি এদের ডেকে ধমকে দিয়ে ধর্ম্মঘট withdraw করতে বলে দিন।"

শরৎচন্দ্র তাঁদেরই ধমক দিয়ে বললেন "No, by no means. ধর্ম্মঘট যারা করেছে তাদের grievance যদি সত্য হয় তাহলে সে সম্বন্ধে সঙ্গত ব্যবস্থা কর।"

কংগ্রেসী কমিশনার উকিল শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ই ধর্ম্মঘট যাতে না চলে তার জন্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়েছিলেন। তিনি খুব চেষ্টা করতে লাগলেন মেথর ঝাড়ুদারদের বুঝিয়ে ধর্ম্মঘট থেকে তাদের নিবৃত্ত করবার। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। ধর্ম্মঘটীরা অবিচল রৈল। আমরা দিবারাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে মেথর ঝাড়ুদারদের মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে তাদের উৎসাহ একতা ও মনোবল যাতে অটুট থাকে তার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ধর্ম্মঘটের নবম দিন বৈকালে হাওড়া ময়দানে একদল ধর্ম্মঘটী বসে ছিল। নির্ম্মল বাবু তাদের বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। মেথররা মেথরোচিত ভাষায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরদিন সকালে আমি মেথরদের মহল্লায় মহল্লায় ঘোরবার জন্য

বেরিয়েছি। নির্ম্মল বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন এক দল মিউনিসিপালিটির জমাদার অতর্কিতে এসে আমায় আক্রমণ করে আচম্বিতে প্রহার আরম্ভ করল। আমি একা, তারা প্রায় জন পনের কুড়ি। চড় ঘুসি কিল অবিশ্রান্ত আমার মাথায় পিঠে বুকে মুখে পড়তে লাগল। ২৷৩ মিনিটের মধ্যেই মাথা ঘুরে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। পরণের জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল, চোখের চশমাটা ভেঙ্গে ছিটকে পড়ে গেল, পায়ের জুতো খুলে গেল তার পরে আরো মিনিট খানেক পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। অজ্ঞান হবার আগে কানে শুনতে পেলুম কারা যেন চেঁচিয়ে বলছে "ইয়ে ত আঞ্জুমানকা বাবু হ্যায়, শালা জমাদার লোক উসকো মারতা হ্যায়।"

যখন জ্ঞান হল দেখলুম জনকতক লিলুয়া কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকের কোলে শুয়ে আছি হাওড়া ময়দানে, তারা আমার মুখে চোখে জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে, একজন ডাক্তার নাড়ী টিপছেন আর নাকে স্মেলিং সল্ট শুঁকাচ্ছেন। যাদের কোলে শুয়েছিলাম তারা বললে "বাবু আপ কাহে নেহি চিল্লায়া, হামলোগ ত নজিগমে থা? হামলোগ আখিরমে নেহি আতা ত তুম ত বিলকুল মর যাতা। হামলোগকো দেখকে তব ত উ শালা লোগ ভাগ গিয়া।"

সহকর্ম্মীরা গিয়ে শরৎচন্দ্রকে আমার উপরে আক্রমণের কথা বললেন। শুনে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। রেগে ইজিচেয়ারের হাতলটা চাপড়ে বলে উঠলেন "This is sheer cowardice. একটা ছোট ছেলেকে এমনি বর্ব্বরের মত ঠেঙ্গিয়ে এরা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতে চায়?'

প্রবোধ বাবুকে ডেকে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করলেন।

শুনেছি তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ করবার হুমকী দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন "I can see the unseen hand in this game. Tell everybody that I want immediate settlement of the strike, otherwise I will issue a statement and taboo the municipality."

বলা বাহুল্য যে তৎক্ষণাৎ এর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। সেইদিনই মিউনিসিপালিটির কমিশনাররা জরুরী পরামর্শ করে আমাদের সঙ্গে মীমাংসার প্রস্তাব করলেন। সে সময়ে রেভারেণ্ড সি এফ্ এণ্ড্রুজ সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বললেন "এণ্ড্রুজ সাহেবকে মধ্যস্ত মানা যাক, তিনি যেমন বলবেন তেমনি ভাবে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করা যাবে। আপনারা রাজী আছেন।"

আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের সম্মতি দিলুম। তার পরের দিনই সকালে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় হাওড়া মিউনিসিপাল অফিসে উভয় পক্ষের সভা হল। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করলুম, ও পক্ষে মিউনিসিপালিটির সমস্ত কমিশনার। সুমীমাংসার জন্যে কমিশনার শ্রীভোলানাথ রায় ও বিজয় দা খুব চেষ্টা করেছিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেবের নির্দ্দেশ উভয় পক্ষই গ্রহণ করলেন। আমাদের দাবী প্রায় সবই পূর্ণ হল।

আলোচনার সময়ে আমার উপরে প্রহারের কথাটাও উঠল। ভোলানাথ রায় মহাশয় নিজে হাতে আমার মুখে রসগোল্লা পুরে দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন।

এণ্ড্রুজ সাহেব সব কথা শুনে আমার কাঁধের উপরে তাঁর ডান হাতখানি রেখে বললেন "You are a great worker. God bless you,"

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললুম I regard your blessing as divine blessing.

এণ্ডরুজ সাহেব খুসী হয়ে আমার মাথায় চুমু খেলেন। ধর্ম্মঘটের মিটমাট হয়ে গেল।

অগম আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল কি বাবা, তোমারইত জয় জয়কার। তোমার ইউনিয়নের demands ত প্রায় সবই fulfilled হল, ভোলা রায়ের হাতে রসগোল্লা খেলে, এণ্ড্রুজ সাহেবের চুমু খেলে, তোমার ত নোবেল প্রাইজ হয়ে গেল। ভাগ্যে মারটা খেয়েছিলে, নৈলে কি আর এসব হত? এই কথা বলে অগম নির্ম্মল চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের চোখের দিকে একটা চোরা কটাক্ষ হেনে দিল। অগম ভারী তুষ্টু!

পরদিন গিয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে বললুম "আপনার জন্যেই জিত হল।"

তিনি আদরের সঙ্গে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন "উঁ হুঁ, জিতেছ নিজেরি জোরে। সত্যিকার দাম দিয়েছ তাই সিদ্ধিলাভ করেছ। দাম যদি না দিতে তাহলে আমি চেষ্টা করেও জেতাতে পারতুম না।"

আমি বললুম "কিন্তু আপনি যদি ঐ রকম রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ না করতেন তাহলে এটা হত না।"

এবারে মৃদু হাস্য করে তিনি বললেন, "তা নয়, ধর্ম্ম এবং ন্যায়

যেখানেই পীড়িত হয়, প্রতিকার সেখানে আপনিই নেবে আসে। এই হচ্ছে নিয়ম, চিরকাল সব যায়গায় এইই হয়ে আসছে। আজ রাত্রে থাক এখানে, কি খাবে বল ?

সেদিন রাত্রে খুব ভূরি ভোজ করালেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে গল্প গুজব করলেন।

রাত্রে তামাক খাচ্ছিলেন আর গল্প করছিলেন। বললেন, "দেখ আজ আমাদের দেশের শ্রমিকেরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়, পীড়ন এবং শোষণও তাদের ওপরে অকথ্য বর্ব্বর ভাবে চলেছে, আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে সংঘবদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে, কিন্তু জেন যেদিন এদের ঘুম ভাঙ্গবে এদের ভিতরে সংঘবদ্ধতা আসবে সেদিন ওদের নিজেদের ভেতর থেকেই ওদের নেতা তৈরী হবে, সেদিন তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে খুসী মনে চলে আসতে পার, তোমাদের মনকে এমনিভাবে তৈরী করে তোলা দরকার। কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায় !" বললুম "কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে ওদের সঙ্গে Identified হয়ে যাই, De-classed হয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে যাই, তাহলে ?"

গড়গড়ার নলে খুব জোরে একটা টান মেরে বললেন "অর্থাৎ তোমরা আর ওরা যদি অভেদ হয়ে যাও, কেমন ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহলে তোমাদের হবে অপমৃত্যু। নাই বা করলে অমন নেতৃত্ব যার জন্যে নিজের স্বত্বাকে পঙ্গু করে ফেলতে হয়। Self help is

the best help. শ্রমিকেরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই পরিচালনা করবার যোগ্য হয়ে যাতে ওঠে সেইটুকু Service যদি তাদের দিতে পার সেইটেই হবে তোমাদের Best service, তার পরেও তাদের আর জড়িয়ে থাকতে যেওনা, তার পরে তারা আপনিই পথ চিনে আপন পায়ে ভর দিয়ে চলবে, তখন তোমরা নেবে ছুটী। তখন তাদের সঙ্গে অভেদ হয়ে তাদের পথেই চলতে যেওনা, তাতে তোমাদের হবে গতিভঙ্গ, কেন না তোমাদের আলাদা পথ আছে আলাদা মিশন আছে, সেটা ভুলে যেওনা। নিজেদের কিছু দিনের জন্য বিলিয়ে দাও তার দরকার আছে কিন্তু হারিয়ে ফেল না।"

জিজ্ঞাসা করলুম, সেটা কি ?

বললেন "নিজের অন্তরের সহস্র দলকে বিকশিত করা, আপন আত্মাকে সমৃদ্ধ করা, নিজেকে আবিষ্কার করা। সত্যের সাধনা করবে শিবের সাধনা করবে কিন্তু পরিশেষে সুন্দরের সাধনাতেই নিজেকে চরিতার্থ করতে হবে, এটা ভুলে যেও না।"

একটু পরে আবার বললেন "সব কথা আজ তুমি বুঝতে পারবে না, কিন্তু এইটে মনে রেখ যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ওদের ওপরে মুড়ুলী করবার মোহ যেন না জন্মায়। সাবালক হলেই ওদের দায়িত্ব ওদের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবার মতন করে মনকে তৈরী রেখ। আর ওদের সঙ্গে অভেদ হবার Idea'ও যেন মনকে পেয়ে না বসে। তুমি essentially যা তাকেই আরো শুদ্ধ করা উজ্জ্বল করা চরিতার্থ করাই তোমার কাজ।"

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম "আমি essentially কি তা বুঝব কি করে ?"

হেসে বললেন "আপনিই বুঝতে পারবে। তোমার অন্তর দেবতা যেদিন বাঁশী বাজাবেন সেদিন তুমি ঠিকই শুনতে পাবে। শুধু সেদিন তাঁকে বিমুখ কোরোনা, সাড়া দিও।"

১৯২৮ সালে বাঙ্গলাদেশে রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত গোলমেলে হ'য়ে উঠল। একসঙ্গে তখন অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারা কর্ম্মধারা ও দল বাঙ্গলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠল। প্রথমত স্বরাজ্য দল তখন কংগ্রেসে বড় দল, এঁরা কাউন্সিল করপোরেশন দখল করে থাকাটাই বড় কাজ করে তুলেছেন। কাউন্সিল ও করপোরেশন দখল করে থাকবার জন্মই বি পি সি সি (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি) দখলে রাখা এদের দরকার, কারণ বি পি সি সির মনোনয়নের মই দিয়েই ত কাউন্সিল করপোরেশন স্বর্গে উঠতে হবে। স্বরাজ্য দলের control তখন বিগ ফাইভের* হাতে। সুতরাং বিগ ফাইভ বি পি সি সি ক্যাপচার করে রাখবার জন্মে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। জেলায় জেলায় তাঁদের কর্ম্মীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন, বি পি সি সি ক্যাপচার করে রাখা চাই। এরা প্রথমেই সুভাষচন্দ্রকে এবং পরে সুরেন্দ্র মোহন ঘোষকে হাত করে ফেললেন এবং এই দুইজন মহাশক্তিধর নেতাকে ক্যাপচার করে অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখনও Triple crown পরে আছেন কিন্তু

* বিগ ফাইব—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী।

তিনি বিগ ফাইভের কাণ্ড ও মতলব দেখে মনে মনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি বেশ দেখতে পেলেন যে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে উচ্ছেদ করবার গোপন আয়োজন বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। তিনি তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বাঙ্গলার অনেক শক্তিমান কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী সেনগুপ্তকে সাহায্য করতে এবং নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত রাখতে উৎসুক হয়ে একটা জোট বেঁধে ফেললেন। এরাও বি পি সি সি ক্যাপচার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অপরদিকে একদল তলে তলে বৈপ্লবিক আন্দোলন (Terrorist movement) আরম্ভ করে দিয়েছেন, তাঁরা তরুণ কর্ম্মীদের ক্যাপচার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর এক দল তখন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অথচ বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত, এরা চান কৃষক শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গণবিপ্লব সংঘটন করতে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী সোসিয়ালিষ্টিক, এরাও তরুণ কর্ম্মীদের ক্যাপচার করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ছাড়া আর একটি ছোট গ্রুপ ছিল—ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি; এরা কমিউনিষ্ট, এদের রাজনৈতিক গুরু এবং অভিভাবক রাশিয়া, এরাও শ্রমিক কৃষক কংগ্রেস কর্ম্মী ও তরুণদিগকে ক্যাপচার করবার কাজে লেগে গেলেন। এইরূপে বাঙ্গলায় তখন একই সঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ, স্বার্থ ও দল কর্ত্তৃক যুব-মন ক্যাপচার করার অভিযান প্রচণ্ড গতিতে আরম্ভ হয়ে গেল।

বাঙ্গলার এই সময়কার অবস্থা বিখ্যাত উপেন দা (উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়) উত্তর কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রিয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছিলেন। উপেনদা তাঁর ভাষণে

বললেন—"আজ আর বাঙ্গলাদেশে কারুরই পৈতৃক প্রাণটা তার নিজস্ব থাকবার জো নেই। সবাই বেরিয়েছে সবাইকে ক্যাপচার করতে। দাদারা (বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মীরা) বেরিয়েছেন ছেলেদের (বয়োকনিষ্ঠ কর্ম্মীগণ) ক্যাপচার করতে, ছেলেরা বেরিয়েছে দাদাদের ক্যাপচার করতে, লীডাররা বেরিয়েছেন চেলাদের ক্যাপচার করতে চেলারা বেরিয়েছে লীডারদের ক্যাপচার করতে। চারিদিকে রব—"ক্যাপচার কর, ক্যাপচার কর।"

সকল দল কর্তৃক এই ক্যাপচার নীতি পরিচালনার ফলে বাঙ্গলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠল। সব দলই সব দলের বিরুদ্ধে নিন্দা কুৎসা ও পরিবাদ রটনা করতে আরম্ভ করে দিলেন। অপরকে গালাগাল দিয়ে অপরকে হেয় করে আপন দলে মানুষ ক্যাপচার করার কৌশলই সেদিন হয়ে উঠেছিল রাজনীতির মূলধন। সেদিন গেছে বাঙ্গলার বড় দুর্দ্দিন। ১৯২৮ ও ২৯ সাল এই দু'বৎসর বাঙ্গলার রাজনৈতিক আবহাওয়া এইরূপ গেছে। প্রত্যেক দলই এ সময়ে খুব সক্রিয়, একদিকে তাঁরা নিজেদের প্রোগ্রাম জোরসে চালিয়ে গেছেন, অপর দিকে অন্য দলগুলিকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে আক্রমণ করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র বিষণ্ণ ব্যথিত চিত্তে এই ক্যাপচার অভিযান ও নিন্দা কুৎসা পরিবাদ রটনার হীনতার ছোঁয়াচ পরিত্যাগ করে নিঃশব্দে দূরে সরে গেলেন। কংগ্রেসে তিনি তখনো রইলেন, কিন্তু নামে মাত্র; কোন দলেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন কিন্তু বিগ ফাইভের দলে ভিড়লেন না। বিগ ফাইভের মধ্যে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন তাঁর 'ব্যক্তিগত

বন্ধু, কিন্তু এ সময়ে নির্ম্মল বাবুর সঙ্গেও তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগ রাখেননি। বিগ ফাইভের অপর কারো সঙ্গেও তিনি রাজনৈতিক বা দলগত যোগাযোগ রাখেননি।

বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রায় সমভাবে দ্বিধাবিভক্ত। বাঙ্গলার প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যক কংগ্রেস কর্ম্মী সেনগুপ্তর অনুচর এবং অপরার্দ্ধ সুভাষচন্দ্রের অনুচর। দুই নেতাতে তখন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অনেকটা দুই সমান সরীকের বিবাদের মতন। দৃশ্যতঃ অবস্থাটা দুই নেতার বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতন দেখালেও মূলত বিবাদটা ছিল দুটি বিভিন্ন জোটের বা গ্রুপের বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটি জোট সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের মুখপাত্র ও নেতারূপে খাড়া করেছিলেন আর একটি জোট সেনগুপ্তকে তাঁদের মুখপাত্র ও নেতারূপে খাড়া করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পিছনে ছিলেন বিগ ফাইভ, বিপিন গাঙ্গুলীর দল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের দল, সরস্বতী প্রেসের দল ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী (অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) দলের নেতারা এবং সেনগুপ্তর পিছনে ছিলেন অনুশীলন সমিতি, খাদি দল, সন্তোষ মিত্রের দল, গৌরাঙ্গ প্রেসের দল এবং সোসিয়ালিষ্ট দলের প্রায় সকলে। দুই দলে আরম্ভ হয়ে গেল ভীষণ বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন দেবাসুর দুই দলে মিলে করেছিলেন সমুদ্র মন্থন তেমনি বাঙ্গলাদেশে এ সময়ে এই দুই দল আরম্ভ করে দিলেন বাঙ্গলাদেশের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র মন্থন।

বাঙ্গলাদেশে এ সময়ে ছোট বড় সকলেই দলাদলিতে মেতে উঠেছিলেন কিন্তু মাতেননি শরৎচন্দ্র। তিনি এতে ব্যথিত হলেন ক্ষুব্ধ হলেন। মনে ব্যথা নিয়ে তিনি এ সময়ে তাঁর সুদূর পল্লীভবন

পানিত্রাসেই বাস করতে লাগলেন, হাওড়া এবং কলকাতায় আসা বন্ধ করে দিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনে কদাচিৎ সহরে আসতেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব নিঃশব্দে ফিরে যেতেন। দুই দলেই তাঁর অসংখ্য স্নেহভাজন কর্ম্মীরা ছিলেন, তিনি তাঁদের পূর্ব্বের মতই দল নির্ব্বিশেষে ভালবাসতে লাগলেন, দলাদলি ও ঝগড়া বিবাদের মেঘ তাঁর মনের স্নেহকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর ছিল প্রকৃত শিল্পীর মন, কবির মন, পেট্রিয়টের মন, বিরাট উদার মন। তাঁর চোখে ছিল স্নেহ এবং করুণা, হিংসা বিদ্বেষের লেশমাত্র তাতে ছিলনা। তাঁর ললাটে ছিল শান্তি আর দীপ্তি, খলতা ক্রূরতার একটি কুঞ্চনও সেখানে ছিলনা। তাঁর আচরণে ছিল অনুরাগ আর প্রেম, বিন্দু পরিমান অবিশ্বাস ও রূঢ়তা তাতে ঠাঁই পায়নি।

সেই দুর্য্যোগের দিনে, বিবাদের দিনে, খলতা ক্রূরতা হিংসা বিদ্বেষের দিনে তাঁর কাছে যে গেছে সেই পেয়েছে শান্তি আর আনন্দ, পেয়েছে প্রেম আর প্রীতি, পেয়েছে বিশ্বাস আর করুণা। মানুষের মনে যে অমৃতলোক থাকে, মানুষ যে ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারে এ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র সে সময়ে দেখিয়ে গেছেন সকলকে। এর পর থেকেই শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে সাহিত্যের দরবারেই পুনরায় চলে গেলেন। রাজনীতিতে তিনি এসেছিলেনও নিঃশব্দে রাজনীতি থেকে তিনি প্রস্থানও করেন নিঃশব্দে। আগমনেও কলরব ছিলনা প্রস্থানেও সাড়াশব্দ ছিলনা। মনের আবেগেই এসেছিলেন আবার মনের ঔদার্য্যেই চলে গিয়েছিলেন। আসার সময়েও কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিলনা, যাওয়ার সময়েও কোন হা-হুতাশ ছিলনা। যে ক'বছর তিনি রাজনীতিতে

ছিলেন অসংখ্য কর্ম্মীকে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। সকলকে তিনি ভালবেসেছেন, সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করেছেন। কোন স্বার্থসিদ্ধি করেননি, ক্ষমতাপ্রিয়তা দেখাননি, আত্মপ্রচার করেননি। তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা ও দুর্ব্বলতার তিনি নিজেই সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসা প্রথম ক'বছর সবচেয়ে বেশী ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি এবং শেষের ক'বছর ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতি। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। তিনি বলতেন 'সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে পারিনে।'

শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্ম্মী সম্মেলন হল। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ও সহকর্ম্মীরা—প্রবোধ বসু বিজয় ভট্টাচার্য্য ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী অগম দত্ত গুরুদাস দত্ত জীবন মাইতি, গুরুপদ মুখোপাধ্যায় বিপিন গাঙ্গুলী ডাঃ ভূপেন দত্ত অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ এঁরা সবাই ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। দলাদলির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হননি। শরৎচন্দ্রকে যখন সম্মেলনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে কর্ম্মীরা গেলেন তিনি বললেন 'আমি যাব না'

"কেন যাবেন না ? হাওড়া জেলার কর্ম্মী সম্মেলন, আপনি যাবেন না কি রকম ?"

"ওখানে সুভাষের নিমন্ত্রণ হয়নি। শিবহীন যজ্ঞে আমি যেতে পারিনে"

একজন খুব রেগে বলে উঠল "আপনার সুভাষ শিব নয়, ভূত।

"ভূত নয়রে ভূত নয়, ভূতনাথ" তিনি বললেন।

কয়েকজন বললেন, "আমরা আপনার কেউ নই ?"

তিনি সজল চোখে বললেন "তোমরা আমার অনেকখানি। কতখানি যে তা মাপাও যায় না—কিন্তু তবু আমি যাব না।"

কর্ম্মীরা বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় নিলেন, তিনি ততোধিক ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বিদায় দিলেন।

যাঁরা তাঁকে আহ্বান করতে গিয়েছিলেন তাঁরাও তাঁর প্রিয়তম আর যিনি আহুত হননি তিনিও প্রিয়তম। দুই সন্তানের বিবাদে জননীর মন যেমন ব্যথিত হয় শরৎচন্দ্র সেদিন মনে তেমনি ব্যথা পেয়েছিলেন।

বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির উপরে তাঁর ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা। স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙ্গলার অবদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ছিল তাঁর ধারণা আর বাঙ্গলাদেশই থাকবে সকলের পুরোভাগে এই ছিল তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত বিশ্বাস। বাঙ্গলাদেশ যে কোনদিন কোন আন্দোলনে কোন প্রদেশ অপেক্ষা পেছিয়ে থাকবে এ তিনি মনে এক তিলও ঠাঁই দিতেন না। তিনি বলতেন "বারদৌলি বারদৌলি বারদৌলি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। মহাত্মার দৌলতে বারদৌলি তালুকের নামই প্রচার হয়েছে সব চেয়ে বেশী। বারদৌলির কৃষকেরাই যে আইন অমান্যের জন্য সব চেয়ে বেশী .তৈরী এর চেয়ে অতিরঞ্জন আর কিছুই নেই। আমি বলছি বারদৌলি না মেদিনীপুরের কৃষকেরাই আইন অমান্যের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী তৈরী।"

বলা বাহুল্য যে প্রকৃতই ১৯৪২ সালের আন্দোলনে শরৎচন্দ্রের এই ভবিষ্যৎ বাণী সপ্রমাণিত হয়েছিল। কতবার আবেগ জড়িত কণ্ঠস্বরে

কত কর্ম্মীর কাছে তিনি বলেছেন "যেদিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য Life and death struggle আরম্ভ হবে, আমি বলছি তোমরা দেখ, সে সময়ে নিশ্চয়ই Lead করবে বাঙ্গালী। আমার এ কথা ফলবে ফলবে ফলবে, কিছুতেই এর অন্যথা হবেনা। এ আমার wishful thinking নয় এ আমার অন্তরের conviction।" বলতে বলতে চোখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠত, শরীর রোমাঞ্চিত হত।

তাঁর এই বিশ্বাসও সত্য করে গেছেন নেতাজী।

শরৎচন্দ্র সুদীর্ঘকাল দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন, কাজও তিনি যথেষ্ট করে গেছেন, কিন্তু তিনি এমনই নিঃশব্দে এবং নেপথ্যে কাজ করে গেছেন যে কোনদিনই তিনি সাধারণের চোখে বড় হয়ে ফুটে ওঠেননি। নিজেকে দেখান ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। আত্ম প্রচার তিনি ঘৃণা করতেন। ওটাকে তিনি মনে করতেন নিজেকে অপমান করা। নিজের কাজের কোন রিপোর্ট তিনি কোনদিন সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন না। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে হাওড়া জেলার বহুস্থানে তিনি ঘুরেছেন, প্রোপাগাণ্ডা ও সংগঠনের কাজে বহু যায়গায় গেছেন, নিজের বহু অর্থও তাতে ব্যয় করেছেন কিন্তু এ সকলের কোন রিপোর্ট তিনি কখনো সংবাদ পত্রে পাঠাতেন না। তিনি নিজে সর্ব্বদাই বলতেন 'দেশের জন্যে আমিত কোন ত্যাগ স্বীকার করিনি' কিন্তু এ ছিল তাঁর বিনয়। সত্য সত্যই কি দেশের কাজে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেন নি? আমরা জানি যথেষ্টই তিনি করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুরাপায়ী ছিলেন। বারুণী সেবনে তাঁর অভ্যাস এবং দক্ষতা, দুইই ছিল অনন্য সাধারণ। দেশী ধেনো থেকে আরম্ভ করে দামী বিলাতী মদ পর্য্যন্ত সবেতেই ছিল তাঁর সমান রুচী। সুরাপানের প্রক্রিয়াও

ছিল তাঁর বিচিত্র। গেলাসে ঢেলে খেতেন, বোতল শুদ্ধ চুমুক দিতেন, দুধ ভাত খাওয়ার মতন শ্যাম্পেন দিয়ে ভাত মেখে খেতেন আবার বৃহৎ কাঁচের বা পাথরের খোরায় ঢেলে প্যাঁকাটির নল দিয়ে চোঁ চোঁ করে টেনে শুষে ফেলতেন। তাঁর এক গেলাসের বন্ধুদের কাছে তাঁর সুরাপানের যে সব অদ্ভুত কাহিনী শুনেছি সে সব রীতিমত রোমাঞ্চকর। সেই নেশা তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক মুহূর্ত্তে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন। লোকে যেমন পোড়া সিগারেটের শেষাংশটুকু পথে ফেলে দিয়ে চলে যায় আর সেদিকে ফিরেও চায় না ঠিক তেমনি করে তিনি অবলীলাক্রমে সুরাপানের অভ্যাসকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আর তার চিন্তাও মনে ঠাঁই দিলেন না। এ যদি ত্যাগ না হয় জানিনা তবে ত্যাগ কাকে বলে।

যখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন তখন তাঁর সাহিত্য খ্যাতি মধ্য গগনে। অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তার সীমা নেই। বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকারা তাঁর লেখা পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাঁর উপন্যাস ছাপা হলে বছর না ঘুরতেই এডিসন শেষ হয়ে যাচ্ছে। যে অর্থ তিনি পেতে আরম্ভ করেছেন তাঁর পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিক সেরূপ অর্থ সাহিত্য সাধনা থেকে পাননি। ওদিকে ভারতবর্ষের সম্পাদক তাঁর পরম সুহৃদ প্রবীণ জলধর দাদা সদাসর্ব্বদা দণ্ডপাণিরূপে তাঁর পশ্চাতে ধাবমান, "শরৎ লেখা দাও, লেখা দাও।" লেখা দিলেই অর্থ, গ্রন্থ প্রকাশ হলেই হাজার হাজার টাকা, কিন্তু কে লেখে? কে লিখবে, তার মন তখন কোথায়? তার মন তখন চলে গেছে বোম্বাইএর চৌপাটীর সমুদ্র তটে যেখানে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের চিতাবহ্নির শেষ শিখাটি

অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিটির সঙ্গে আলিঙ্গন করছে সেইখানে। জলধর দাদা বলছেন "শরৎ একটা নূতন লেখা আরম্ভ কর" আর তিনি দিগন্তে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলছেন "দাদা তিলক ত শুধু আমাদের ভাই নন বন্ধু নন নেতা নন, তিনি যে আমাদের তেত্রিশ কোটি মলিন ললাটে শুভ্র গৌরব তিলক, সেই তিলক আজ মুছে গেল, আজ আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলুম !"

জলধর দাদা চাদরে চোখ মুছে ফিরে যান। ফিরে যান কিন্তু থাকতে পারেন না বেশী দিন, স্নেহের টানে দরদী বৃদ্ধ আবার ফিরে আসেন 'শরৎ অনেক দিন ত কিছুই লেখনি, এবার একটা আরম্ভ কর।' শরৎচন্দ্র গড়গড়ার নল ফেলে দিয়ে উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠেন "লেখা? কার জন্যে লেখা? কি লিখব, কেন লিখব, কি হবে লিখে? বাসন্তী দেবী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে সার্জ্জেন্টের হাতে গ্রেপ্তার হলেন, তবু বাঙ্গালী সেদিন লাট সাহেবের বাড়ীতে বসে খানা খেয়ে এল, এখনো লোকে বিলাতী কাপড় পরছে, এখনো তারা গভর্ণমেণ্টের চাকরী করছে, এখনো কোর্ট কাচারীতে উকিল ব্যারিষ্টার গিস্ গিস্ করছে? Shame, Shame, We are a nation of slaves, serfs and helots, shame on us."

জলধর দাদা ফিরে যান, আবার ফিরে আসেন, আবার যান আবার আসেন। মাকুর মতন তিনি কেবলই ফিরে যান আর ফিরে আসেন, কিন্তু যাকে দিয়ে তিনি লেখাবেন তাঁর মন তখন বিচরণ করছে হরতাল আর ধর্ম্মঘটের মধ্যে, মিটিং আর পিকেটিংএর মধ্যে, চরখা আর তাঁতের মধ্যে।

একদিন জলধর দাদা এসে দেখলেন শরৎচন্দ্র নিবিষ্ট মনে লিখছেন। মুখ তার প্রসন্ন, চোখ উজ্জ্বল, কলম ধাবমান, পাশের গড়গড়া উপেক্ষিত, কলিকার আগুন অনাদরে নির্ব্বাপিত।

বড় আনন্দ হল বৃদ্ধের। আহ্লাদে হাতের লাঠিটা সজোরে মেঝেয় ঠুকে শরৎচন্দ্রকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন "ব্রেশ ব্রেশ! তাহলে শরৎ এতদিনে আবার কলম ধরেছ? লিখছ তাহলে!"

শরৎচন্দ্র মুখ তুলে বললেন "হ্যাঁ দাদা, লিখছি।" জলধর দাদা খুসী হয়ে পাশে এসে চেয়ারে বসে বললেন, "কি এটা আরম্ভ করলে ভাই?"

অগ্রজতুল্য প্রবীণ সুহৃদের জন্য কষ্ট হল শরৎচন্দ্রের মনে। একটু ম্লান হেসে বললেন, "গল্প উপন্যাস নয় দাদা, দেশবন্ধু জেল থেকে বেরুলেন, মির্জ্জাপুর পার্কে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভা হবে তারই অভিনন্দন পত্র রচনা করছি।"

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল জলধর দাদার মুখ। বহুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন "নাঃ আর তোমাকে বিরক্ত করব না, আমরা তোমাকে হারিয়েছি।" আবার খানিক নীরব থেকে তিনি বললেন "ছুটেছে তোর মন বারণ, কেনে মোরা করব বারণ?"

এমনি করে কাটতে লাগল শরৎচন্দ্রের বছরের পর বছর। তিনি যদি সে সময়ে একান্তমনে উপন্যাস রচনা করে যেতেন তাহলে আরো অনেক বই লেখা হত তাঁর, অনেক অর্থই আসত সিন্দুকে। এ যদি ত্যাগ না হয় তাহলে ত্যাগ কাকে বলব?

শরৎচন্দ্রের দরদী মন সহকর্ম্মীদের প্রতি স্নেহে এবং অনুরাগে ভরপুর ছিল। প্রবোধ বাবু ছিলেন ক্রনিক এনিমিয়ার রুগী। স্বাস্থ্য

তাঁর ভাল ছিলনা।' সেই অপটু শরীর নিয়ে তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মভোলা হয়ে খেটে খেটে মাঝে মাঝে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়তেন। শরৎচন্দ্র কতবার তাঁকে এমনি অবস্থায় বকে ঝকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একবার জীবন মাইতি এপেণ্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। শরৎচন্দ্র একমাস কাল প্রতিদিন তার অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ নিয়েছেন। মৌড়ীর নারাণদা কংগ্রেসের কাজে হাওড়ায় এসে সারাদিন কাজকর্ম্ম সেরে সন্ধ্যায় বাড়ী যাওয়ার আগে যখনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তিনি তখনি যত্নের সঙ্গে তাঁকে আদর করে বসিয়ে গরম গরম লুচি বেগুন ভাজা আলু ভাজা দিয়ে পেট ভরে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিতেন, কোনদিন অভুক্ত যেতে দিতেন না। কত কর্ম্মীকে রাজবন্দীকে তিনি অতি সঙ্গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন। যখন তিনি শিবপুর থেকে চলে গিয়ে পানিত্রাস সামতাবেড়ে বাস করতে লাগলেন তখন পরিচিত কর্ম্মীরা তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে গেলে বৈকালে ফেরবার সময়ে পেট ভরে গরম লুচি না খাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। তাঁর বাড়ীর চা খাওয়ার পেয়ালাগুলো ছিল অদ্ভুত। এত বড় যে সেগুলোকে মগ বলাও চলতে পারত। সেই বড় বড় পেয়ালা ভর্ত্তি চা তিনি খাওয়াতেন সবাইকে, অল্প খাইয়ে তৃপ্তি হত না তাঁর। ছেলে ছোকরারা অনেকে যেত দেখা করতে, তিনি খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্প করে বলতেন তোমরা নিজেরা একটু গল্প কর আমি একটু বিশ্রাম করে আসি। এই বলে তিনি ভিতরে চলে যেতেন বিশ্রামের জন্যে, আর যাবার সময়ে তাঁর হাভানা চুরুটের কাঠের বাক্সটি ও দিয়াশলাইটি ইজিচেয়ারের হাতলের উপরেই রেখে যেতেন।

প্রায় শতখানেক করে হাভানা চুরুট সেই বাক্সে ভর্ত্তি থাকত। ছোকরাদের মধ্যে যারা তাম্রকূট পিপাসার্ত্ত তারা সেই বাক্স থেকে রসদ সংগ্রহ করে বাড়ীর পাদদেশে রূপনারায়ণের তীরে গিয়ে ধূমপান করে আসত।

অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতেই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করেন। মতিবাবু যখন রোগশয্যায় শায়িত সেইসময়ে শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মতিবাবু ছিলেন যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য জার্নালিষ্ট তেমনি অকৃত্রিম স্বদেশ ভক্ত। অসহযোগ আন্দোলন তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বললেন "একবছরেই আমরা স্বরাজ লাভ ক'রব, Swaraj is sure within 31st December." আসমুদ্র হিমাচল তখন আন্দোলনের তোড়ে উদ্বেলিত। অনেকেই তখন আশা করেছিলেন যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ হবে। মতিবাবু দেশের মুক্তি দেখে যাবেন এই ছিল তাঁর বড় সাধ। তিনি বলেছিলেন "শরৎ বাবু আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন ৩১শে ডিসেম্বর দেখে যেতে পারি।" মতিবাবু ৩১শে ডিসেম্বর দেখে যেতে পারেননি, তার পূর্ব্বেই ওপারের ডাক এসে গেল তাঁর। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বহুদিন পরেও এই কথা যখনি বলতেন চোখ তাঁর ছল ছল করে উঠত "অতবড় পেট্রিয়ট বড় দেখা যায় না, কী আকাঙ্খাই তাঁর ছিল স্বরাজ দেখে যাবার। অবশ্য ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলেও তিনি স্বরাজ দেখে যেতে পারতেন না, কিন্তু শুধু স্বরাজ দেখে যাবার জন্যেই যে মানুষ গোটা কতক দিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি কত বড় মানুষ কত বড় পেট্রিয়ট

ছিলেন বলত ?” বলতে বলতে মতিবাবুর উদ্দেশে তিনি যুক্তকর মাথায় ঠেকাতেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে শরৎচন্দ্র চরখা খদ্দরের প্রোগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। চরখা কাটলে যে স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিলনা। তথাপি তিনি খদ্দর ছাড়া অপর বস্ত্র ব্যবহার করতেন না, যত্ন করে চরখা কাটাও শিখেছিলেন, কারণ কংগ্রেস চরখা খদ্দরের প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিল। তিনি যে চরখায় বিশ্বাসী নন এ কথা মহাত্মাজীও জানতেন। একবার মহাত্মাজী কলকাতায় এসে সারভেণ্ট কার্য্যালয় দেখতে যান। সারভেণ্ট কার্য্যালয় তখন বহুবাজার হুজুরীমল লেনে অবস্থিত। দেশবন্ধুর বাড়ী থেকে অনেকেই মহাত্মাজীর সঙ্গে সারভেণ্ট কার্য্যালয়ে গেলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন বি পি সি সির প্রেসিডেণ্ট। সারভেণ্ট কার্য্যালয়ে গিয়ে মহাত্মাজী সবাইকে নিয়ে চরখা কাটতে চাইলেন। কতকগুলি চরখা আনা হল, অনেকেই মহাত্মাজীর সঙ্গে বসে চরখা কাটা আরম্ভ করলেন। শরৎচন্দ্রও চরখা কাটতে লাগলেন। শরৎচন্দ্রের সুতা খুব ভাল হচ্ছিল। শ্যামবাবুর সুতা বড় মোটা হচ্ছিল। মহাত্মাজী শ্যামবাবুকে দেখিয়ে পরিহাস করে বললেন “Look look, the president of the B.P.C.C. is spinning ropes.” সকলে সেই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র হেসে বললেন Nearer the church, remoter from God.”

মহাত্মাজী বললেন Sarat Babu you have no faith in Charka ?

শরৎচন্দ্র বললেন No, not a jot,

মহাত্মাজী। But you spin better than many lovers of Charka.

শরৎচন্দ্র। I have learnt spinning because I have love for you though not for the Charka.

মহাত্মাজী মৃদু হেসে বললেন But why do'nt you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning ?

শরৎচন্দ্রও হেসে বললেন No, I don't believe. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.

এই কথা শুনে মহাত্মাজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন। শরৎচন্দ্র নির্ভিক অকুণ্ঠভাবে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করতে কোনদিন কারো কাছেই দ্বিধা করতেন না।

কিন্তু মহাত্মাজীর নন-কো-অপারেশন প্রোগ্রামে শরৎচন্দ্রের গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। দেশবন্ধুর গৃহে একদিন তিনি মহাত্মাজীকে বলেছিলেন Mahatmaji, you have discovered the most dreadful and invincible weapon Non-co-operation. If our people withdraw their co-operation the Government will collapse in a day. We can then get Swaraj not in a year, but in twenty four hours.

একদিন দেশবন্ধুর গৃহে মহাত্মাজীকে নিয়ে সকলে গল্প করছিলেন,। কথা হচ্ছিল কোন বাঙ্গালীর সঙ্গে মহাত্মাজীর কবে

প্রথমে আলাপ হয়েছিল। কিরণ শঙ্কর রায় বললেন ও গৌরবটি আমার পাওনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমি যখন ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে বিলেতে ছিলাম, মহাত্মাজী তখন বুয়র যুদ্ধে এ্যাম্বুলেন্স কোরের কার্য্যোপলক্ষে বিলেতে এসেছিলেন। মহাত্মাজীর তখন খেয়াল হয়েছিল বাঙ্গলা শেখবার। আমাকে উনি মাষ্টার রেখেছিলেন।"

দেশবন্ধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন "তাই নাকি? তা ছাত্রটিকে কতখানি বাঙ্গলা শিখিয়েছিলে কিরণ?

কিরণ বাবু অপ্রতিভভাবে বললেন "ছাত্রটি যে তেমন ধারাল ছিল না, তাইত শিক্ষা তেমন এগুল না।"

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন Mahatmaji, Kiran was your Guru in England?

মহাত্মাজী ঈষৎ হেসে বললেন Yes, he taught me Bengali.

শরৎচন্দ্র বললেন That is why you could not learn it. সকলে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

রাজনীতি বড় অদ্ভুত বস্তু। মানুষের মনে এ বস্তু যে কত রকমের অস্বাভাবিক আর উদ্ভট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি হুগলী জেলা, আর থাকতেনও তিনি হাওড়া জেলাতে, হুগলী জেলা থেকে দু'পায়ের পথ মাত্র, কিন্তু তথাপি তিনি হুগলী জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের কাছে বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছেন। ১৯২৭ সালে হুগলী সহরে হুগলী জেলা কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ১৯২৮ সালে হরিপালে, পর বৎসর আরামবাগ মহকুমার ডোঙ্গল গ্রামে. এবং তার পরের বৎসর হুগলী সদর মহকুমার

সোমড়া' গ্রামে হুগলী জেলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রত্যেকটি সম্মেলনই যথেষ্ট জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জেলার বাহিরের নানাস্থানের কংগ্রেস কর্ম্মীরা এই সব সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পুরুলিয়ার স্বনামধন্য কর্ম্মী ৺নিবারণ দাশগুপ্ত, বিখ্যাত ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, হাওড়ার শ্রীরতনমনি চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী কলিকাতার ডাঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, ৺বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় খাদী প্রতিষ্ঠানের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীসতীস চন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই সকল সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়েছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র কখনো নিমন্ত্রিত হননি। হুগলী জেলা কংগ্রেস বরাবরই খাদী দলের হাতে ছিল। জানি না কি কারণ, শরৎচন্দ্র চরখা কাটলে স্বরাজ হবে বিশ্বাস করতেন না বলেই হয়ত বা এঁরা তাঁকে জেলা সম্মেলনের এতগুলো অধিবেশনের একটাতেও আমন্ত্রণ করে আনার প্রেরণা পাননি। কারণ যাই হোক, অথবা কোন কারণ আদৌ থাক বা নাই থাক, একবারও অন্ততঃ তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলে ছিল ভাল, ইতিহাসে কলঙ্কের দাগটুকু আর লাগত না।

'কিন্তু দেখেছি এই উপেক্ষা শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করতে পারেনি। একদিন কথাটা তাঁর কাছে পেড়েছিলুম। আমি দুঃখ প্রকাশ করতে তিনি বললেন "ডাকেনি তাতে আর হয়েছে কি? বরঞ্চ ভালই হয়েছে যে ডাকেনি, ডাকলে হয়ত মুশকিল হত।'

প্রবোধ বাবু ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'মুশকিলটা আবার কি হ'ত?'

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন 'মুশকিল হতনা? আমার ত এই ট্রেচারাস

শরীর, বেশ চলছে, হঠাৎ বিনা নোটিশে কোনদিন যে বিগড়ে বসে তার ঠিক নেই। যদি শারীরিক কারণে যেতে না পারতুম তাহলে গালাগালি খেতে হত আবার গেলে বলত বক্তৃতা কর। তাহলেই ত গেছিরে বাবা! বাঙ্গলা লেখাপড়া জানে, খানকতক গল্পের বই পর্য্যন্ত লিখে ফেলেছে অথচ বক্তৃতা করতে পারে না, এ কি কেউ বিশ্বাস ক'রত?

প্রবোধ বাবু সহাস্যে বললেন 'তাহলে একটা কণ্ট্রোভার্সির আজকেই শেষ হয়ে যাক দাদা। আপনি হুগলী জেলার কি হাওড়া জেলার? আপনি মেনে নিন যে আপনি হাওড়া জেলার।'

শরৎচন্দ্র বললেন 'বাঃ আমি কবে ডিনাই করেছি যে আমি হাওড়া জেলার নই?'

প্রবোধ বাবু। না তা নয়, এখন এইটে মেনে নিন যে আপনি হাওড়ারই, হুগলীর নন। হুগলীর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, একদিন সেখানে জন্মেছিলেন এই? কিন্তু যাদের ভেতরে জন্মেছিলেন, তারা একদিন আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজও তারা ডাকে না। আর হাওড়াতে নিজে এসে আপনি ঘর বেঁধেছেন, আমাদের এত ভালবেসেছেন, আপনি আমাদের সকলের মাথার মণি। বলুন যে আপনি হাওড়ারই, হুগলীর নন।'

শরৎচন্দ্র এবারে খুব হেসে বলে উঠলেন "আরে পাগল, আমি বললেই বা তারা তাদের ক্লেম ছাড়বে কেন? তাদের পাঁঠা তারা ন্যাজেও কাটতে পারে ঘাড়েও কাটতে পারে। যখন যেমন ইচ্ছে তখন তেমনি করবে, আজ উপেক্ষা করলেও যে কাল আবার আদর করবে না তার গ্যারান্টি তুমি কোথায় পেলে? জ্যান্তে ভাত কাপড়

না দিতে পারে কিন্তু মরে গেলে ত দান স্যাগর করতে পারে? অতএব তোমার মনোপলির ক্লেম টিকবেনা।'

কিন্তু হুগলী জেলার ফরাসী অধিকৃত সহর চন্দননগর তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিল ১৯৩০ সালে। বাঙ্গলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র চন্দননগরের নিমন্ত্রণ তিনি আগ্রহসহকারে রক্ষা করতে এসেছিলেন অসুস্থ দেহ নিয়েও। কানাই দত্ত, রাসবিহারী বসুর জন্মভূমির ডাক তাঁকে উল্লসিত করেছিল। এখানকার বিপ্লবযুগের নেতা চারুচন্দ্র রায়, মতিলাল রায়, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রবর্ত্তক সংঘ আশ্রমে একটা বৈঠকী সভার আয়োজন করেছিলেন। চন্দননগরের মুক্ত রাজবন্দী শ্রীবলাই চাঁদ দে মহাশয় তাঁকে পাণিত্রাসে গিয়ে সঙ্গে করে চন্দননগরে নিয়ে এসেছিলেন। প্রবর্ত্তক সংঘ আশ্রমে তিনি একদিন ছিলেন। বৈঠকী সভাতে তিনি খোলাপ্রাণে অনেক বিষয় আলোচনা করেছিলেন, সাহিত্য এবং রাজনীতি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাষণ চন্দননগরের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীফটিক লাল দাস মহাশয় হুবহু লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণ এখনো ফটিক বাবুর কাছে আছে, যদি সে ভাষণ কোনদিন ছেপে প্রকাশিত হয় তাহলে বাঙ্গলাদেশ সে সম্পদ ভোগ করতে পারবে। যে সম্মান তাঁকে হুগলী জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা কোনদিন দিতে পারেননি সে সম্মান তাঁকে চন্দননগরের বৈপ্লবিক নেতারা দিয়েছিলেন। ধন্য চন্দননগর!

শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে মাস লীডার ছিলেন না। অথচ Mass এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তিনি এমন মিশতে পারতেন যে সে রকম বোধ

হয় বাঙ্গলাদেশের কোন্ ইনটেলেকচুয়াল ব্যক্তিই পারতেন না। তাঁর সমগ্র সাহিত্যেও তার ভূরি ভূরি নিদর্শন ও প্রমাণ বিস্তৃত ভাবে ছড়ান আছে। কিন্তু তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারতেন না, জনসভায় তিনি বক্তৃতা করতে পারতেন না। কি এক রকম ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতেন। সেইকারণে জনসভা তিনি এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু যাঁরা মাস লীডার তিনি তাঁদের লীডার ছিলেন; তিনি তাঁদের বুদ্ধি দিতেন, পরামর্শ দিতেন, গাইড করতেন। কিরণশঙ্কর রায়ের মতন কুশাগ্র বুদ্ধি ব্যক্তিও তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন আবার সুভাষচন্দ্রের মতন জননেতাও তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন চিন্তাশীল ব্যক্তিও তাঁর মনীষার প্রসাদ গ্রহণ করতেন। কত বড় স্বদেশ প্রেমিক যে তিনি ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সৌভাগ্যলাভ করেছেন তাঁরাই তা উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছেন। পলিটিক্যাল কর্ম্মক্ষেত্রে নিঃস্বার্থপরায়ণতায় শরৎচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। যাঁরাই পলিটিক্স করেন তাঁরা সকলেই পলিটিক্স থেকে কিছু না কিছু আহরণ করেনই। কেহ স্বার্থ, কেহ নাম যশ, কেহ ক্ষমতা, কিছু না কিছু প্রত্যেকেই গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছুই নেননি। পলিটিক্সে তিনি শুধু দিতেই এসেছিলেন, কণামাত্রও গ্রহণ করেননি। তিনি জানতেন যে তিনি বড়, তিনি শিল্পী, তিনি চিরজীবি। ভগবান তাঁকে যে অনন্ত ঐশ্বর্য্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তার অপরিমেয়তা তিনি আপন অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই মানুষের কাছে তিনি কিছুই যাচ্ঞা করতেন না। তিনি শুধু দুহাতে দান করতেন কখনো অঞ্জলি পেতে কিছু চাইতেন না। অথচ এতই বিনীতভাবে থাকতেন যে লোকে তাঁর

অন্তরের বিরাট দাতামূর্ত্তি দেখতেই পেত না। খুব-সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকলে তিনি যে তাঁর অন্তরের মধ্যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পদ সম্বন্ধে সচেতন একথা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করলেও বুঝা যেতনা। লোকে মনে করত তিনি উদাসীন, খেয়ালী, বোকা, সুযোগ গ্রহণে অক্ষম, অনুদ্যোগী। কিন্তু এর কোনটাই তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ত্যাগী, তিনি ছিলেন বিরাট, তিনি ছিলেন আপন মহিমায় মহিমান্বিত। পলিটিক্স থেকে আহরণযোগ্য কোন তুচ্ছ বস্তু তাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য শুনি? কোন ক্ষমতা কোন পদ তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করতে পারত? হাওড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানগিরি? কাউন্সিল এ্যাসেমব্লীর সদস্যগিরি? বি পি সি সির সভাপতিত্ব? একবার তাঁর ভক্তেরা তাঁকে কলকাতার মেয়র করবার জন্যে উৎসুক হলে তিনি তাঁদের বলেছিলেন "অনেক ছেলেমানুষী ত তোমরা প্রতিদিনই করছ, আমাকে নিয়ে ও ছেলেমানুষীটা আর তোমরা কোরোনা।" আধুনিক বাঙ্গলাদেশের মনকে যিনি দিয়ে গেলেন গড়ে, যিনি দিয়ে গেলেন অক্ষয় অমর সাহিত্য তিনি কিসের লোভে হাত বাড়াবেন অতি অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ পদের দিকে? যে ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গা নিয়ে এলেন মর্ত্তে তিনি কিসের মোহে যাবেন কূপের বারি পান করতে?

স্বদেশকে তিনি ভালবাসতেন অন্তরের অন্তর থেকে, তাই দেশের মুক্তির আন্দোলনে এসে যোগ দিয়েছিলেন সর্ব্বান্তঃকরণে। দেশের স্বাধীনতা তিনি চাইতেন সকলের আগে, তাই দেশের মুক্তি যজ্ঞের যাঁরা পূজারী সানন্দে এসে মিশেছিলেন তাঁদের সমাজে, তাদের সঙ্গে সাজিয়েছিলেন ঘর কন্না। দেশের স্বাধীনতা ছিল তাঁর অন্তরের ধ্যান, মাথার মণি, তাই স্বাধীনতার সৈনিক মাত্রকেই তিনি অকৃত্রিম-

ভাবে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, ভায়োলেন্স নন-ভায়োলেন্সের তারতম্য সেখানে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করত না। তাই যে অহিংস সত্যাগ্রহী গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে তার জন্যেও যে চোখে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন আবার যে সাগ্নিক বিপ্লবী ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে তার জন্যেও তিনি সেই চোখেই অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন। যে আন্তরিকতার সঙ্গে বিলাতী পণ্য বয়কটের প্রোপাগাণ্ডার জন্য অর্থ দান করেছেন সেই আন্তরিকতার সঙ্গেই এ্যাব্‌সকণ্ডার বিপ্লবীকেও অর্থ সাহায্য করেছেন।

যেমন ছিল তাঁর বিরাট মনীষা তেমনি ছিল তাঁর উদার অন্তঃকরণ, তাই ছোট বড়র প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। তিনি বলতেন 'যে ছোট তার শক্তি কম, কিন্তু হলই বা শক্তি কম, আন্তরিকতা যদি কম না হয় তাহলে তাকে অবহেলা করবার কি আছে? কাঠ বেড়ালীকে কি রামচন্দ্র অবহেলা করেছিলেন?' এই নীতি তিনি নিজের আচরণে পালন করতেন সর্ব্বদাই। তাই দেখেছি তিনি চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্র কিরণ শঙ্করের সঙ্গেও যতখানি সিরিয়াসলি আলোচনা করতেন, অগম জীবন আমার সঙ্গেও ততখানিই সিরিয়াসলি আলোচনা করতেন, কোন তুচ্ছ কর্ম্মীকেই কোনদিন তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য করতেন না।

রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সত্যই ছিলেন শরতের চাঁদ। সে চাঁদে আলো ছিল দীপ্তি ছিল হাসি ছিল মধু ছিল আর ছিল একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ। সে চাঁদের কিরণে মনের সন্তাপ দূর হত, অন্তর আলোতে উদ্ভাসিত হত।

বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনে শরৎচন্দ্রের অবদান কতখানি

তার পরিমান নির্ণয় করার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু জানি তিনি অনেক দিয়েছেন; যে অসংখ্য কর্ম্মীদল তাঁর সঙ্গে মিশেছিলেন তিনি তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এত দিয়েছিলেন যে আমরা সব সময়ে তার সবখানি নিতে পারিনি, আমাদের হৃদয়ে কতটুকু স্থান ছিল? আজ মনে হয় যদি আমাদের হৃদয় আরো বড় হত তাহলে তাঁর অজস্র দানের অতখানি হয়ত উপচে পড়ে যেত না। তাঁর মৃত্যুর পরে শোকার্ত্ত সুভাষচন্দ্র শূন্য মনে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহ প্রাঙ্গণে দুটি বিন্দু অশ্রু অর্ঘ্য রেখে আসবার জন্যে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যে শব যাত্রা হয়েছিল তাই দেখে কিরণশঙ্কর রায় শোকাকুল হয়ে বলেছিলেন "এই কি বাঙ্গলার মনুষ্যত্ব, এই কি বাঙ্গলার কৃতজ্ঞতা? আজ বাঙ্গলার এত বড় সাহিত্যিক, এত বড় পেট্রিয়ট লোকান্তরিত হলেন, এই কি তাঁর শবযাত্রা! সমস্ত কলকাতা ভেঙ্গে পড়ল না কেওড়াতলার শ্মশানে।

যাক শ্মশানে লক্ষ লোক জমা হয়নি তার জন্যে দুঃখ নেই, লক্ষ লক্ষ লোকের বুকের মধ্যে তিনি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন অনবদ্য অমর সাহিত্য— সে সাহিত্যসুধা পান করতে করতেই লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁর তর্পণ করছে প্রতিদিন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই, তাঁকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দেবে কে? বাঙ্গলাদেশ তাঁকে ভুলবে কি করে? তিনি যে নিপুণ তুলির সপ্তবর্ণ দিয়ে বাঙ্গালীর ঘর কন্না বাঙ্গালীর হাসি-কান্নার কালজয়ী অক্ষয় ইন্দ্রধনু রচনা করে গেছেন, বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে সে চিরদিন দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। চোখ থাকলে সে বস্তু আপনি চোখে পড়বে, তাকে না দেখে থাকবার উপায় নেই।

তাঁর সমস্ত সাহিত্যের সর্ব্বত্রই তাঁর জ্বলন্ত দেশভক্তি ও অকৃত্রিম দেশপ্রীতি সুপরিস্ফুট। দেশকে সমাজকে স্বদেশবাসী মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। দেশের প্রতি তাঁর এই গভীর প্রেমই তাঁর সাহিত্যকে অমন উজ্জ্বল করেছে অমন মোহিনী শক্তি দিয়েছে। অতখানি দেশভক্তি না থাকলে অত বড় সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন না।

যে দেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেই দেশপ্রেমের প্রেরণাতেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। একই স্বদেশপ্রেম তাঁকে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবুদ্ধ করেছে। সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে একই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান না করে পারতেন না। যে অন্তরের ধর্ম্ম তাঁকে দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়েছিল সেই অন্তরের ধর্ম্মই তাঁকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঠেলে দিয়েছিল। তাই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনটি না জানলে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা হয় না, তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপটি উপলব্ধি করা হয় না।